একক ১ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ মুঘল ইতিহাসের উপাদান
১.২ মুঘল সাম্রজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর
১.৩ আকবরের পূর্বে মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তার
১.৪ বাবরের ভারত পর্যালোচনার সত্যতা
১.৫ হুমায়ুন

১.০ প্রস্তাবনা

মুঘল যুগের ইতিহাস পড়ার অর্থ হল প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানা। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের এক গু(ত্বপূর্ণ পর্যায় হ'ল মুঘল সাম্রাজ্য। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন, তবে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই আকবরের আমলে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা হয়। এই গ্রন্থের চারটি পর্যায় থেকে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার, পতন, বিভিন্ন আর্থসামাজিক দিক, ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসার ইত্যাদির কথা জানতে পারি।

১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপনা

মুঘলদের ভারতে শাসনের বিস্তারিত তথ্য ইউরোপ-কেম্ব্রিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত উপাদানগুলি থেকে পাওয়া যায়। এর কারণ ইউরোপীয়রাই ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাস লিখতে শু(করে। এদের মধ্যে আছেন হেনরী মেন, ম্যাকলে, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি বৃটিশ প্রশাসনিক ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস ব্রিটিশ দখলদারদের হাতে বিকৃত হয়। তারা এই মতবাদ উপস্থাপন করে যে পূর্ববর্তী সভ্যতা ছিল দিব্যতান্ত্রিক এবং তাদের সভ্যতা এই দিব্যতান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে উন্নত। এ্যানি বিভারেজ "তুজুকে-ই-বাবুরী ভুল ভাষ্য প্রদান করেন। তিনি অযোধ্য নিয়ে লেখেন। এছাড়া ইতিহাসের কালবিভাজনেরও সমস্যা আছে। মধ্যযুগীয় ভারতকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাথে তুলনা করা হয়। সামাজিক নিয়মকানুন ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারত ও ইউরোপকে সমান্তরাল ধরা হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল বর্বর ও অন্ধকারযুগ। ইউরোপীয়রা একইভাবে ভারতের ঐ সময়কে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নি(ত করেছে। এছাড়াও এই ইতিহাস ছিল উত্তর কেন্দ্রীক। ইউরোপীয় কালবিভাজনে বর্তমানকে গৌরবান্বিত করার সাথে সাথে মধ্যযুগের ইতিহাসকে হেয় করার উপর জোর দেওয়া হয়।

মুঘল রাজত্বের সময়কালের ইতিহাস জানার পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া যায়। ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল বাদশাদের সময়ানুত্র(মিক শাসনের বিবরণীই শুধুমাত্র আছে তা নয়। প্রত্যেক শাসনের একাধিক লিখিত বিবরণ আছে। এই সময়কার লেখাগুলি ফার্সি ভাষায় লেখা। এগুলি রাজসভার ঐতিহাসিক এবং সে সময়কার ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী দ(লোকদের দ্বারা লিখিত। ভারতে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি(হিসাবে আর্বিভাবের সময় থেকে মুঘল বাদশাদের সময়কালের শাসনের সাধারণ ইতিহাসও বেশ কিছু লেখা আছে। তাই এই উপাদানকে সরকারী এবং

বেসরকারী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

সরকারী উপাদানে আত্মচরিত বা জীবনীগুলিকে ফেলা যায়। এগুলি মূলত সরকারী সহায়তায় বা সরকারী খবরের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। রাজ দরবারের বিবরণ এবং সময়ানুত্র(মিক ঘটনাপঞ্জী পারসিকদের দ্বারা লিখিত। এই রচনাগুলি রাজা বা রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি(দের দ্বারা লিখিত। অন্য সরকারী নথীর মধ্যে রয়েছে সরকারী চিঠি, আইন, ঘোষণা, ফর্মান, দলিল, সরকারী নথী হিসাবে র(িত আদালতের আদেশ ও বিধিবদ্ধ আইনগুলি।

বেসরকারী উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান হল বিদেশীদের দ্বারা লেখা বিবরণী। এছাড়া আছে প্রাদেশিক বেসরকারি উৎস, মৌখিক ইতিহাস ও কৃষ্টিয় শিল্পকলা।

জীবনী ও আত্মচরিত

তুজুক-ই-বাবরী ও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর আত্মচরিত দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নিজের স্মৃতিকথা তুজুক-ই-বাবরী এই সময়কার প্রথম রচনা। এটি তার অবসর সময়ে লেখা তুর্কীতে আত্মজীবনী। দুঃখের বিষয় এ'টি সম্পূর্ণ নয় এবং এর প্রাপ্ত সমস্ত কপিগুলিতে তিনটি ফাঁক থেকে গেছে। মুঘল শাসনের সমস্তকালে এ'টি এত জনপ্রিয় ছিল যে এটি চারবার ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়। বাবরের শাসনকালের এবং হুমায়ুনের জীবনের আদিপর্বের এটি সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। লেখকের রচনা শৈলী সহজ অকপট এবং তাজা। এখানে তিনি নিজের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেননি। রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর বর্ণনা ছাড়াও তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি(দের নিখুত বর্ণনা এতে আছে। আছে রাজত্বের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। এছাড়াও মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতের খুব সুন্দর তুলনা বাবর দিয়েছেন। মধ্য এশিয়ার রাজনীতি এবং অবস্থা, যা নাকি তাঁকে ভারতে আসতে বাধ্য করেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুজুক-ই-বাবরীতে পাওয়া যায়। এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি শত্রুদের উপর অত্যাচার না করার উপদেশ দেন। তিনি কবিও ছিলেন এবং সাহিত্যের প্রতি তার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। মধ্য এশিয়ার কৃষ্টি ও ভৌগলিক দৃশ্যপট এই আত্মজীবনীতে ধরা দেয়। ভারতের আবহাওয়া নিয়ে তিনি অখুশী ছিলেন এবং তাই মৃত্যুর পর কাবুল নদীর ধারে সমাহিত হবার ইচ্ছা তিনি এই বিবরণীতে লিখে যান। তবুও এই উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনীর সবকিছু যাচাই না করে সঠিক বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এই আত্মজীবনীর তৃতীয় খন্ডকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস বলে ধরা যেতে পারে। এটি সেই সময়ের এক অন্যতম চিত্রাকর্ষক রচনা।

অপর আত্মজীবনীটি হচ্ছে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী। এ'টি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুই খন্ডে রচিত আত্মজীবনী। তিনি নিজে ১৭ বছর ধরে এই স্মৃতিকথা লেখেন। এরপর এই কাজ মুট্টামুদিন খাঁর উপর ন্যস্ত হয় এবং তা রাজকীয় শাসনের ১৯ বছরের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে। মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হবার পরের সম্পূর্ণ কাহিনী এতে ধরা আছে। তিনি নুরজাহানের সাথে তার সম্পর্ক এবং কিভাবে তিনি (মতা দখল করেন তার বর্ণনা দেন।

এই খন্ডদুটি মূলত ভারতের সাথে মুঘলদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়টির উপর জোর দেয়।

এরপরেই বাবর এবং হুমায়ুন সংত্র(ান্ত খবরাদির সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ উপাদান হল তারিখ-ই-রসিদি। এটি বাবরের গুণগ্রাহী এবং বন্ধু তাঁর ভাইপো মীর্জা মহম্মদ হায়দার দৌলত রচনা করেন। যেহেতু লেখক নিজের চোখে নানা ঘটনা বিশেষ করে বাবরের জীবন সংগ্রাম এবং হুমায়ুনের কা(্মীর বিজয় দেখেছেন তাই এ'টি বাবর এবং হুমায়ুনের বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। ঐতিহাসিক খন্দ আমিরের লেখা হাবিব-উসসিয়ার এবং হুমায়ুননামা প্রসিদ্ধি লাভ করে। হাবিব-উসসিয়ার তেহেরানে মুদ্রিত হয়। বাবর এবং হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম তিন বছরের উপর এটি আলোকপাত করে।

হুমায়ুনের নির্দেশেই হুমায়ুননামা লেখা হয়। এ'টি বিস্তৃতভাবে হুমায়ুনের তিন বছরের শাসন বর্ণনা করেছে।

হুমায়ুনের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে এ'টি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। সমসাময়িক কালের একই রকম উল্লেখযোগ্য আর একটি গ্রন্থ হল আহাসান-উস-সিয়ার। এটি মীর্জা বরখারদারের লেখা এবং এটিতে পারস্যের শা ইসমাইলের সাথে বাবরের সর্ম্পকের বর্ণনা দেয়। হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগমের লেখা হুমায়ুননামা আকবরের বাসনা এবং প্রথম দুই মুঘল শাসকের স্ত্রীদের এবং পুত্র, কন্যা, ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে পারিবারিক সর্ম্পক তদোপরি সামাজিক ও হারেমের জীবন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। হুমায়ুন রাজত্বের আর একটি ঘটনাপঞ্জী হল তৌহর আফতাবের তাজকিরত-উল-বাকিয়ত। এ'টি আকবরের আদেশে ১৫৮৭ সালে লেখা হয়। হুমায়ুনের বাল্যকাল সর্ম্পকে এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র। শাতাহমাস্পস্রে তাজকিরাত-ই-তাহমাস্পসে্ হুমায়ুনের পারস্যবাসের ইতিহাস পাওয়া যায়। বায়জিৎ বিয়াতের স্মৃতিকথা এবং তারিখ-ই-হুমায়ুন দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম কিছু বছরের বর্ণনার আর একটি বিশেষ সূত্র হল গিয়াসুদ্দিন মহাম্মদ খন্দ আমিরের লেখা কানুন-ই-হুমায়ুনি।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম ধারাবিবরণী হল হাফি মুহম্মদের তারিখ-ই-আকবর। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি কান্দাহারী বলেও পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনীর লেখা তারিখ-ই-বদাউনী তিনটি খন্ডে পাওয়া যায়। প্রথম খন্ডে বাবর ও হুমায়ুনের সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খন্ড পুরোপুরিভাবে আকবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে লেখা এবং ১৫৯৪ সাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তাঁর রাজত্বকালের প্রশাসনের সমালোচনামূলক বিবরণ, তাঁর স্বভাব ও বিশেষভাবে তাঁর ধর্মের সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ একজন ধর্মান্ধ সুন্নী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা বলে আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মীয় নীতির একটি প(পাতদুষ্ট বিবরণ। সমগ্র মুঘল যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বিখ্যাত সুফী পন্ডিত শেখ মুবারকের পুত্র আবুল ফজল-আলামী। তিনি আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং আক্বরের আমলের ইতিহাস রচনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর আকবরের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। তবে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর শৈলী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাকে তিনি অতিমানব হিসাবে গণ্য করতেন, তাঁর প্রতি চাটুকারিতার দোষে বিকৃত হয়েছে। আবুল ফজলের দু'টি বিখ্যাত বই হল আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা। তিন খন্ডে বিভক্ত(আকবরনামায় মুঘল রাজপরিবারের ইতিহাস তৈমুর থেকে হুমায়ুনের সময়কাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও ৩য় খন্ডে ১৬০২ এর মধ্যে আকবরের রাজত্বকালের সমস্ত ঘটনা এবং তাঁর পিছনে উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। আকবরের জীবন ও সময়কার প্রতিটি ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ করা আছে। 'আইন-ই-আকবরী' ও তিন খন্ডে রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মূলতঃ আকবরের সমস্ত বিভাগ এবং সমস্ত বিষয়ে যা যা নিয়ন্ত্রণের ধারা ছিল, তার সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও পররাষ্ট্র ও অন্যান্য বিষয়ের পরিসংখ্যানগত খুঁটিনাটিও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তৃতীয় খন্ডে রচয়িতার পূর্ব ইতিহাস ও বইয়ের তালিকা রয়েছে। আকবরের শাসননীতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র হল আইন-ই-আকবরী। খ্বাজা নিজাম-উদ্-দিনের তাবাকাৎ-ই-আকবরী মুসলমান শাসনের শু(থেকে আকবরের রাজত্বকালের ৩৯তম বর্ষ পর্যন্ত ইতিহাসের দলিল।

যেখানে আবুল ফজলের লেখা সমাপ্ত হয় প্রায় সেখান থেকেই, মানে আকবরের রাজত্বের ৪৬তম বর্ষের থেকে আবুল ফজলের আকবরনামারই পরবর্তী ইতিহাস হল ইনায়তুল্লাহর তাকমিল-ই-আকবরনামা। মুল্লাহ মুহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহের "গুলশন-ই-ইব্রাহিমী" হল জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত মুসলমান ভারতবর্ষের ইতিহাস।

আকবরের সময়কার দুই লেখক বদাউনী ও আবুল ফজলের পারস্পরবিরোধী রচনাই ওই সময়কার সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ উপাদান। বদাউনী বলেছিলেন, "আকবর ইসলামের ধ্বংসকারী।" আবুল ফজলের বক্ত(ব্য "আকবর নিজেই ঈশ্বর।"

যদিও শাহজাহান আত্মজীবনী রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিহাস রচনা করা হয়েছিল এবং রচনার অগ্রগতি তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রচুর জীবনী রচনা পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত উন্নতমানের

কালপঞ্জীও সহজলভ্য। এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম কাজ হল শাহজাহানের নির্দেশে লিখিত মুহম্মদ আমিন কাজিনিভির পাদশাহনামা। এই একই নামের বিখ্যাত বইয়ের লেখক আবদুল হামিদ লাহোরি। দুই খন্ডের এই বইতে শাহজাহানের জীবন ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে রাজপুত্র ও দ্বিতীয় খন্ডে শাসক হিসাবে শাহজাহানের কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। মুহম্মদ ওয়ারিস রচিত আর এক পাদশাহনামা থেকে আমরা শাহজাহানের রাজত্বকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে পারি। ইনায়ত খানের শাহজাহাননামায় ১৬৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের (মতা দখল ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ অধিকারের সময়কার ইতিহাস রচিত হয়েছে। আবার মুহম্মদ সাদিক খানের শাহজাহাননামায় সম্রাটের সিংহাসনারোহণ থেকে (মতাচ্যুতি পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি ছাড়া জাহাঙ্গীরের সময়ের অন্যান্য রচনাও পাওয়া যায়। যেমন খ্বাজা কাঙ্গাঁর গাইতাতের মাসির-ই-জাহাঙ্গীরি। অন্য দু'টি গু(ত্বপূর্ণ রচনা হল মুতামিদ খানের ইকবালনামা ও মুহম্মদ হাদিসের ওয়াকুয়াত-ই-জাহাঙ্গীরি।

যদিও ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ করেছিলেন তাসত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মূল্যবান রচনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের আলমগীরনামা। এটি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ১০ বছরের সরকারী ইতিহাস। এই সমস্ত ইতিহাস রচনায় কোনো বাধা ছিল না। তিমুরিদ রাজবংশের সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় মুহম্মদ হাশিম কাফি খান রচিত মুন্তাখাব-উল-লুবারে। এই গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেরও সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। পরের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মুহম্মদ সাকি মুস্তাইদ খানের মাসভি-ই-আলমগিরি। এটি সরকারী কাগজপত্র ও নথিপত্রের ওপর নির্ভর করে রচিত ঔরঙ্গজেবের সময়ের একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ। আকিল খান রচিত জফরনামা-ই-আলমগিরিও একটি গু(ত্বপূর্ণ উপাদান। ঔরঙ্গজেবের দুই হিন্দু কর্মচারীও ঔরঙ্গজেবের সময়কার গু(ত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন। ভীমসেন দা(ণাত্যে একজন কর্মচারী নিযুক্ত(হয়ে অনেক সত্য ও ঘটনা প্রত্য(করেছিলেন। এইগুলি তিনি "নক্সা-ই-দিলখুশা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৬৭০-১৭০৭ পর্যন্ত সময়ে দা(ণাত্যে মুঘলদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানার জন্য এই বই খুবই কার্যকরী। ১৬৫৭ থেকে ১৬৯৮ এর মধ্যে রাজস্থানের ইতিহাস পাওয়া যায় ফুতুহাত-ই-আলমগিরি নামে ঈশ্বের দাসের লেখা এক বিস্তৃত বিবরণে।

জীবনীসাহিত্য কয়েকটি সমস্যার দ্বারা বিশেষভাবে জর্জরিত।

ক) মূল পাঠ্যাংশের বিকৃতি

খ) কোন কোন সময়ে প্র(িপ্তি

গ) পৃষ্ঠপোষকতার সমস্যা

ঘ) দেশে প্রচলিত কিছু গল্প

যেহেতু সমস্ত ফার্সী রচনাই সুন্দর হস্তা(রের ওপর নির্ভর করত, তাই মূল পাঠের থেকে টুকে রাখার রেওয়াজ ছিল। এই টোকার পথ ধরেই কেউ কেউ নিজের ভাবনাচিন্তাও লিখে ফেলতে শু(করে। এইভাবে বইয়ের বিকৃতি ও কোন কোন সময়ে প্র(িপ্তি শু(হয়। উপরন্তু যেহেতু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী রচিত হত, তাই এগুলি হত রাষ্ট্র-সদৃশ এবং রাষ্ট্রের কথা ছাড়া আর খুব কিছুই রচিত হত না। এই দলিলগুলি উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখানোর এক প্রচেষ্টা। নীচের থেকে ইতিহাস রচনার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এতে দারিদ্র্য, শ্রমিকের শোষণ, দুর্ভি(ের কথা তুলে ধরা হয়নি। সুতরাং বিদেশী পর্যটকদের রচনা, যাতে দরিদ্র মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এই প(পাতদুষ্ট লেখাগুলির কোনো মিল নেই। এই রাষ্ট্রীয় দলিলগুলি অত্যন্ত ব্যক্তি(গত মতামতভিত্তিকও বটে।

আঞ্চলিক সরকারী নথিপত্রের মধ্যে সালিমুল্লাহর "তারিখ-ই-বাঙ্গালা" বাংলার ইতিহাসের প(গু(ত্বপূর্ণ। শাহজাদা সুজার বাংলার শাসক থাকার সময়কার বিবরণ দেওয়া রয়েছে মুই মুহম্মদের "তারিখ-শাহ-সুজা"তে। মীরজুমলার

কুচবিহার আত্র(মণের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় শিহাবুদ্দিন আহমদ তালিশের রচনায়। শিতাব খানের "বাহারিস্তান-ই-খালিবি" তেও বাংলার ইতিহাস পাওয়া যায়। গুজরাটের ইতিহাস পাওয়া যায় আলি মুহম্মদ খানের "মীরাট-ই-আহমদি" থেকে। দা(ণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে জানার জন্য অনেকগুলি রচনা গু(ত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে সৈয়দ আলি তবাতবার "বুরহান-ই-মাসির", হাবিবুল্লাহর "তারিখ-ই-মুহম্মদ কুতব্শাহী এবং জাহি(দ্দিন জাহুরির-রচনা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারতের ইতিহাসের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা হল "তারিখ-ই-সিন্ধ" যা গুজরাটে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল নিয়ে রচিত, এবং মীর-আবু-তুরাব-ভালির "তারিখ-ই-গুজরাট"। পূর্ব ভারতের ইতিহাসের জন্য "তারিখ-ই-আসাম" যা মীরজুমলার অভিযান নিয়ে রচিত অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ।

অন্যান্য সরকারী উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ হল ঃ—

ক) ফরমান অর্থাৎ রাজকীয় ইচ্ছা বা রাজকীয় নির্দেশ। আকবরের সময়কার পাঁচটি রাজকীয় ফরমান খুব গু(ত্বপূর্ণ। এগুলি হল ১. তারিদাতা-ই-ফরমান-ই-সালাতিন-ই-দিল্লী, ২. আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মথুরার নাথ গোস্বামীকে দেওয়া করবিহীন ভূমি অনুদান। ৩. তাখবরের মুঘল ও যোগী যাদের কাছে পাঞ্জাবের তাখবরের নাথ যোগীদের দেওয়া আকবরের রাজকীয় ফরমান রয়েছে।

খ) রাজস্ব দলিল ঃ— এই উপাদানগুলির মধ্যে পরিসংখ্যানগত সমী(া ও সাম্রাজ্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত(হয়েছে। রাজস্ব আইন-কানুন, পরিসংখ্যান ইত্যাদিসহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাজকীয় ইস্তেহারের নাম হল "দস্তুর-উল-আমল"। কোনো হিসাবের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও রাজস্বের নথিপত্র পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক তথ্যের বিপুল সম্ভার পাওয়া গেছে এতে। ঔরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের প্রশাসন সম্বন্ধে জানার প(এটি অমূল্য।

গ) আরেকটি গু(ত্বপূর্ণ উপাদান হল সংবাদ ও ইশতিহার। এগুলি আখবারাত-ই-দরবারী মৌলা নামে পরিচিত। এগুলি হল দরবারের ইস্তেহার ও সংবাদপত্র। রাজস্থান আর্কাইভসে এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংর(িত আছে। এই আখবারাত-ই-দরবারী মৌলা অনেক পান্ডুলিপিতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই লিখিত। রাজার কল্যাণমূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে মনসবদাররা লিখে দরবারের দেওয়ালে সেঁটে দিতেন। কখনও ঢাক বাজিয়ে অথবা মুখেও বলে যাওয়া হত এইসব কাজকর্মের কথা। বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সচিবরা শ্রেণীবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সঙ্কলন রেখে গেছেন। এগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পত্রসাহিত্যের এক বিশিষ্ট শৈলী হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বেশ কিছু খন্ডে প্রাপ্ত এই পত্রসাহিত্য ইনশা-আল্লাহ বা মাকতুবাত বা (কয়াৎ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আদ-বি-আলমগিরি, আহকাম-ই-আলমগিরি ইত্যাদি গ্রন্থে কয়েকটি চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠিগুলি থেকে দরবারী ষড়যন্ত্র ও নাগরিক ও জনসাধারণের প্রতি সম্রাটের মনোভাব জানতে পারা যায়।

এই উপাদানগুলি ব্যক্তি(গত মতামতের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য অত্যন্ত সাবধানে এগুলি ব্যবহার করা উচিত।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ঃ—

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচুর ইওরোপীয় পর্যটকের ভারতে আগমন ঘটে। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল বণিক, চিকিৎসক, দূত, ধর্মীয় প্রচারক, নাবিক, ভাগ্যান্বেষী এবং সমস্ত রকমের অভিযানকারীরা। তাদের মধ্যে কেউ ব্যবসার সন্ধানে, কেউ নতুন জীবিকার সন্ধানে, এমনকী কেউ কেউ নতুন দেশে, নতুন মানুষদের কাছে নতুন এক জীবনের খোঁজে এসেছিল। এদের ব্যবহার ছিল অদ্ভুত, রীতিনীতি ছিল অভিনব। তারা যা দেখেছিল ও শুনেছিল তা লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদান রেখে গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘাত শু(হয় ষোড়শ শতক থেকে। ভারতে এইসময় নিয়মিত মানুষজন আসতে শু(করেন। মার্কোপোলোর পথ ধরেই ইওরোপীয়ানরা ভারতবর্ষে আসতে থাকে কিন্তু তাঁরা কেউই অল-বে(ণী বা ইবন বতুতার মত প্রাজ্ঞ (intellectual) ছিলেন না। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন পথ ধরে ইওরোপীয় পর্যটকরা দলে দলে এদেশে আসতে শু(করেন। বিভিন্ন

ঐতিহাসিক বা সেই অর্থে কালপঞ্জীর রচয়িতারা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে মুঘল ইতিহাস রচনা করেছেন।

আকবরের রাজত্বের (১৫৮৩-৯১) মধ্যে র‍্যালফ ফিচ্ নামে একজন ইংরেজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর লম্বা যাত্রায় তিনি সব ধরনের খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র, জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, দিউ থেকে আগ্রা থেকে বাংলা এবং সেখান থেকে পেগু এবং পরে দ(িণ ভারত এবং সিংহল পর্যন্ত ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বেশ কিছু পন্ডিত জাহাঙ্গীরের দরবারেও এসেছিলেন। ১৬০৮-১১ সালের মধ্যে উইলিয়াম কিঞ্চ ভারতে আসেন এবং জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে লিখে গেছেন। উইলিয়াম হকিন্স সপ্তদশ শতাব্দীর সুরাটে বসে লিখেছিলেন। ১৬০৮ সালে সুরাটে এসে রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে উষ(অভ্যর্থনা লাভ করার পর সেখানে ১৬১১ পর্যন্ত থাকেন। সুরাটে তিনি ১৬০৮-১১ সাল পর্যন্ত কাটান। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে দা(িণাত্য নীতি ঘোষণা করা হয় ও মুঘল দরবারে মারাঠাদের অবস্থান স্থির করা হয়।

প্রথম জেমসের কাছ থেকে আরেকটি চিঠি নিয়ে উইলিয়ম এডওয়ার্ড ১৬১৫ সালে ভারতবর্ষে জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌঁছন। এর তিন বছরের মধ্যেই স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তাঁর রচনা খুবই গু(ত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ ষড়যন্ত্র, বি(্বাসঘাতকতা এবং দুর্নীতিতে পূর্ণ একটি দরবারে কাজকর্ম কিভাবে চালনা হত, সেই ইতিহাসের প(এই রচনা অপরিহার্য। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা হলেন টেরী এবং ফরাসী ট্র্যাভেরনিয়ের এবং বার্নিয়ার। ফ্রান্সের উদয় এবং ফরাসী বিপ-ব সম্বন্ধে তথ্য খুব সহজেই সংগ্রহ করা যেত। বার্নিয়ার পূর্ব ভারতের ওপর জোর দেন। ফ্রান্সিস পেলসারি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং কিছু মূল্যবান পর্যবে(ণ নথিভুক্ত(করেন। ডি-ফ্যাক্টও ঐ একই সময়ে ভারতে আসেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে দুজন ইংরেজ বণিক ভারতে আসেন। এরা হলেন ব্রুটন এবং কার্টরাইট। এরা বাংলা ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। পিটার মুন্ডির ভ্রমণ শাহজাহানের দরবারের ১৬৩০-৩৪ এবং ১৬১৯-৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। রেনেল ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। নিকোলো মানুচ্চি নামে এক ইটালীয় (ভেনেশিয়ান) ভারতবর্ষে বহুদিন থাকার পর "স্টোরী ডো মোগোর" নামে এক জনপ্রিয় রচনা সৃষ্টি করেন। আরও দুয়েকজন হলেন নিকোলো কান্ট, জাঁ-ডে-থেভেনশ' প্রমুখ।

যদি আমরা সঠিকভাবে এই উপাদানগুলি বি(েষণ করতে পারি তাহলে দেখব এই উপাদানগুলি খুবই গু(ত্বপূর্ণ। এগুলি প(পাতহীন, গোঁড়ামিহীন এবং খোলা মনে রচিত। যারা এই রচনাগুলি লিখেছেন তারা কেউই ঐতিহাসিক ছিলেন না। তাই অল বে(নীর মত পান্ডিত্য এবং সমালোচনার গুণ তাদের ছিল না। সাধারণ মানুষের সহজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই রচনাগুলি রচিত হয়েছে। এগুলি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয় এবং ভৌগোলিক ধারণা প্রায়শঃই ভুল। ভারতের অতীত সম্বন্ধে রচিত কোনো ঐতিহাসিক দলিলের নাগাল পাওয়া তাদের সাধ্য ছিল না। তৎকালীন ঘটনাবলীর জন্য তাঁদের মূলতঃ বাজারচলিত গল্পের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। উপরন্তু ভারতের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি ভাষা সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মবাদের দেশ বলে ভাবা হত এবং রচনাগুলি ভ্রান্ত ধারণা এবং ভুল তথ্যের শিকার হত।

অন্যান্য বেসরকারী উপাদান ঃ—

ক) সাহিত্য

খ) শিল্প / স্থাপত্য / চিত্রকলা

গ) মৌখিক ইতিহাস।

সাহিত্য ঃ—

সাহিত্যগত উপাদান পরো(ভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের যোগান দিয়েছে। মুঘল ইতিহাস পুর্ণলিখনের জন্য এগুলি

ব্যবহার করা হয়। মুঘলযুগে দরবারী সাহিত্য এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। আরবী ও ফার্সী ছাড়া অন্যান্য ভাষাও সহাবস্থান করত। সাম্রাজ্যের সংহতির সময় ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত প্রাধান্য লাভ করে।

আকবরের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সী ও সংস্কৃত যথেষ্ট গু(ত্ব লাভ করে। ফার্সী ও স্থানীয় কথ্য ভাষাগুলির মিশ্রণের ফলে স্থানীয় ভাষাগুলির বিকাশ ঘটে। আঞ্চলিক ভাষা যেমন হিন্দভি এই সময়েই পরিণতি লাভ করে। এই সময়েই রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। তুলসীদাসের রামায়ণ সপ্তদশ শতকের উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে ধারণা দেয়। উপরন্তু আঞ্চলিক কবি, লেখক যেমন তুকারাম, একনাথ প্রমুখের রচনা মারাঠী সাহিত্যের বিকাশ ঘটায়। শিবাজীর গু(রামদাসও এই সময়ের প্রচুর তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। রাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতার সম্বন্ধে ধারণা মেলে তুলসীদাসের রচনা থেকে। শিখদের ইতিহাস, শিখধর্মের নীতিসমূহ, শিখদের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" বা "আদিগ্রন্থ" খুবই গু(ত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের বিবরণ অত্যন্ত উগ্র আঞ্চলিকতার পরিচয় দেওয়ায় এই বিবরণ মুঘল গ্রন্থাদির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাম্রাজ্য ছাড়া, মারাঠারা এক অর্ধ রাষ্ট্র, হিসাবে আভাসিত হয়ে উঠেছিল যা তুকারাম, একনাথ প্রমুখের লেখনীতে পরিস্ফুট। মহারাষ্ট্রীয় কবিতাগুলিকে বলা হত বাখার। শিবাজীর সম্বন্ধে প্রথম এবং সবচেয়ে মূল্যবান রচনা হল কৃষ(জীর "শিব-ছত্রপতিচেন চরিত"। শিবাজীর পুত্র রাজারামের আমলের কবি অনন্ত সুভাসদ বা সুভাসদ বখর অসমাপ্ত কলমী বখর শেষ করেন ও "শিবকালিন-পত্রসার-সাঙ্গঁলা" এবং "শিব-চরিত-সাহিত্য" রচনা করেন। অসমীয়া ভাষায় রচিত কিছু বুরাঞ্জতী স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গু(ত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে। দ(িণে মালয়লী ভাষায় রচিত কিছু রচনা দ(িণ ভারতের আলাদা পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে। এতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ও প্রতিপত্তি ও ঐ অঞ্চলের সাপে(সাম্রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা মেলে। এই সময়ের পূর্বে জয়দেবের চৈতন্যের ওপর রচিত মঙ্গলকাব্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধারণা দান করে। এই সাহিত্যগুলি থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে সাধারণ মানুষের জীবন মোটেও সুখী ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক শাসনকেই শুধুমাত্র অন্ধকার বা দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী করা যায় না। তাছাড়াও এই সাহিত্যগুলি তখনকার মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধেও তথ্য পরিবেশন করে।

শিল্প/স্থাপত্য/চিত্রকলা ঃ—

তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, ময়ূর সিংহাসন ও মিনিয়েচার চিত্রকলা মুঘল যুগের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশের নির্দশন। মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারী এইরকমই একটি নির্দশন। এগুলিতে পারসীক ও ভারতীয় শৈলীর যে মিশ্রণ দেখা যায় তার সূত্রপাত মুঘল যুগেই ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আগ্রা দুর্গ একজন চৌহান রাজা নির্মাণ করেছিলেন। পরে হুমায়ুন এই দুর্গ জয় করেন। পারসিক গম্বুজ শৈলীর দ্বারা মন্দির শিল্প প্রভাবিত হয়। কিন্তু এই শিল্পকে কোনোভাবেই ইসলামি শিল্প বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় শিল্প ইউরোপীয় শিল্পধারার দ্বারাও প্রভাবিত হতে শু(করে। গোয়াতে চ্যাপ্টা ছাদ, জানালা ফ্রেম ইত্যাদিতে তা সুস্পষ্ট। এগুলির মাধ্যমে আত্তীকরণ এবং অর্থনৈতিক জীবনের সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। যদিও স্থাপত্যের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়, কিন্তু কোষাগার শূন্য হয়ে যাওয়া ছিল একটি অদ্ভুত ঘটনা। এইভাবে প্রত্নতত্বগত উপাদানগুলি থেকে সাংস্কৃতিক প্রভাব, একাত্মকরণ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

মৌখিক ইতিহাস ঃ—

অলিখিত উপাদান খুবই সহজলভ্য, যেমন গান, লোককথা, গদ্য কালপঞ্জী, কিছু কাব্যসাহিত্য, রাজস্থানের প্রচলিত কিংবদন্তী ও রাজস্থানের ব্যালাড। এগুলি টডের রচনায় একত্রিত করা হয়েছে। এর নাম "অ্যানালস এ্যান্ড অ্যান্টিকুইটি অফ রাজস্থান।"

বাংলা সাহিত্যে স্মৃতিকথা, পাঁচালী, ব্রতকথা, কিংবদন্তী কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর

মধ্যে ব্রজবুলির বিকাশ ঘটে। মথুরা ও রাজস্থানের কিছু সঙ্গীত, রাধাকৃষে(র প্রেমকাহিনী, মধ্যপ্রদেশের মৃগনয়নীর কাহিনী, রাজবাহাদুর ও রাণী রূপমতির প্রেমকাহিনী ছাড়া বৈজু বাওরা ও তানসেনের গান অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিচিত।

এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনোটিকেই এককভাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনোটিই এককভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠাও করতে পারে না। বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণের দ্বারাই ইতিহাস রচিত হয়। এই উপাদানগুলির প্রামাণ্যতা অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে বারেবারে নিরীখ করে নিতে হয়। উপরন্তু ঐতিহাসিকদের উচিত শুধুমাত্র সরকারী উপাদানের ওপর নির্ভর না করে বেসরকারী উপাদানগুলিকেও কাজে লাগানো।

১.২ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর

স্ট্যানলি লেনপুলের মতে "বাবর সম্ভবত প্রাচ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি(ত্ব। তিনি যে লেখনীর দ্বারা। তাঁর স্মৃতিকথায় এই সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, তা তাঁর খ্যাতির প(বড় কম কথা নয়। তিনি মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে হানাদার বাহিনী ও রাজকীয় সরকারের মধ্যে এবং তৈমুর ও আকবরের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিলেন।" এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ অপহরণকারী, যারা জাতিতে ছিলেন মোঙ্গল ও তুর্কী অর্থাৎ চিঙ্গিঁস খাঁ ও তৈমুর লঙের রক্ত(তাঁর শিরায় প্রবাহিত হয়েছে। এর ফলে তাঁর মধ্যে সাহস ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পরে তাঁর মধ্যে পারসীকদের সংস্কৃতি ও নাগরিকতার জন্ম হয়। জাহির উদ্দিন মহম্মদ বাবরের শু(র দিকের ইতিহাস অবি(শ্বাস্য সাফল্য, বিস্ময়কর বিপর্যয়ের ইতিহাস যা মধ্য এশিয়ার একান্ত নিজস্ব, তা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। দুই দুর্ধষ বিজেতার রক্ত(তাঁর শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। তৈমুরের পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর তিনি। পিতার তরফ থেকে তিনি এই বি(ত্রাস বীরের ঐতিহ্য পেয়েছিলেন। মায়ের প(থেকে তিনি চেঙ্গিঁস খানের বংশধর ছিলেন। বাবরের মায়ের নাম ছিল কুতলুগনিগার আনুম। তাঁর পরিবার মূলতঃ তুর্কীর চাঘতাই ভাগের সদস্য হলেও তিনি সাধারণভাবে মুঘল নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে মুঘলদের উৎপত্তি মোঙ্গঁলদের থেকে। চেঙ্গিঁস খান এবং তৈমুর দু'জনেই মোঙ্গ ঁল গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় হয়তো মুঘল নামটি সেখান থেকেই প্রাপ্ত।

তৈমুরের ভারত আত্র(মণ (১৩৯৮-৯৯) ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলেনি। তবে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল উজবেগ ও পারস্যের সাফাভিদদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। মির্জা নামে পরিচিত তার বংশধরেরা তাদের সাধারণ ঐতিহ্যের সংহতি সাধনে ব্যর্থ হন। এদের মধ্যে ওমর শেখ মির্জা নামে একজন উত্তরাধিকার সূত্রে ফরগানা প্রদেশ পেয়েছিলেন। ফরগনাতেই ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে বাবর জন্মগ্রহণ করেন। ওমরের মৃত্যুর পর মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবর ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরগনার শাসক হয়ে ওঠেন। এর পর দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি তাঁর খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইদের সাথে ত্র(মাগতঃ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মুঘলদের জেষ্ঠ্যপুত্রের সিংহাসনে সর্বময় অধিকারের তত্ত্ব ছিল না বলেই এই ধরনের যুদ্ধ ঘটত। এই সময়ে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা রাজ্য ও তাঁর রাজধানী সমরখন্দ জয় করা। এমনকী ১৪৯৬ সালে তিনি প্রথমবার সমরখন্দ জয় করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরের বছর তিনি একই চেষ্টা চালান। এবার তা সফল হয়। কিন্তু সমরখন্দে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই খবর ফরগনায় পৌঁছানমাত্রই সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পর তিনি ফরগণায় পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু তত(ণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। যখন বাবর আবার সমরখন্দে পৌঁছন, তাঁর পিতৃব্য আহমদ মির্জার কাছে তিনি একজন দূত পাঠিয়ে জানান ফরগণা জয় করার পর তিনি ঐ সিংহাসনে অন্য কাউকে বসাবেন। এই প্রস্তাব যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। কিন্তু ভাগ্যত্র(মে আহমদ মীর্জা সমরখন্দে পিছিয়ে

যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনায় তাঁর মামা মাহমুদ খান যদিও দুঃখ পান, তবুও ফরগণা শেষ পর্যন্ত র(া পায়। কিছুদিন পরে তিনি আবার সমরখন্দ জয় করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৪৯৮ সালে বাবর ফরগনা হাতে পেলেও ১৫০০ সালে আবার তা হস্তচ্যুত হয়। ১৫০০-১ সালের মধ্যে বাবর সমরখন্দ জয়ের মরীয়া প্রয়াস চালান। কিন্তু উজবেগ সর্দার শৈবানী খান তাঁকে পরাজিত করেন এবং দ্বিতীয়বার ঐ শহর দখল করেন। ১৫০২ সালে সার-ই-পালে তিনি বাবরকে পরাজিত করেন। বাবর ৮ মাসের মধ্যে আবার সমরখন্দ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। শৈবানী খানের সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে তবে তিনি নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৫০৪ সালে বাবরের কাবুল জয় ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য এবং এখানে তিনি তার প্রধান কেন্দ্রস্থাপন করেন। আবারও আর্চিয়ানের যুদ্ধ বাবরের ভবিষ্যৎ নতুন করে গঠন করে। এর ফলে তাঁর উচ্চাকাঙ(া ও নীতিতে নতুন একমাত্রা যোগ হয়। তিনি তাঁর জন্মের স্থানকে শেষ বিদায় জানিয়ে, তাঁর প্রবল প্রতিপ(ের মুঠো থেকে বেরিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে নিজের ভাগ্য অন্বেষণে বের হন। কাবুলের রক্ত(পাতহীন বিজয় বাবরের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এখানে তিনি এমনই এক ঘাঁটি স্থাপন করতে পেরেছিলেন যে হয় পশ্চিমে সমরখন্দ বা পূর্বে হিন্দুস্থান এই দু'টির মধ্যে যে কোন একটিতে মনোনিবেশ করতে পারতেন। প্রথমে কাবুলেই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের পরিকল্পনা করেন। এর মানে এই ছিল না যে তিনি মধ্য এশিয়ায় তাঁর উচ্চাকাঙ(ার কথা ভুলে গেছিলেন। নিজে পছন্দ করে নয়, ঘটনাচক্রে(র চাপেই তিনি হিন্দুস্থান যাত্রা করেন। তিনি তাঁর ভাইদের কাছে সাহায্য চাইলেও রিক্ত(হস্তেই ফেরত আসেন এবং ফলতঃ তিনি শাহ ইসমাইলের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হন। তাঁর সাহায্যে তিনি সমরখন্দ আবার জয় করেন এবং বুখারা ও খোরাসান দখল করেন ১৫১২ সালে। ইতিমধ্যে উজবেগরাও তুর্কীস্থানে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তিনি কান্দাহারও জয় করেন ও হারান। শাহ ইসমাইল বাবরের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠান এবং পারসিকদের হাতে আবদ্ধ বাবরের বোনকে ফেরৎ পাঠান। বাবর শাহের নাম খুৎবায় পড়বেন এবং বারোজন ইমামের সঙ্গে তাঁর নামও মুদ্রায় খোদাই করবেন, এই শর্তসাপে(তিনি বাবরকে সাহায্য করতে রাজী হন। কিন্তু উজবেগদের হাতে শাহ ইসমাইলের পরাজয় এবং ১৫১৪-তে তাঁর মৃত্যু বাবরের মধ্য এশিয়ায় সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। সমরখন্দের সিংহাসন যা তিনি তিনবার পেয়েছিলেন ও হারিয়েছিল তাতে আবার আরোহণ করার সমস্ত আশা বিলুপ্ত হয়। মধ্য এশিয়ার একমাত্র অঞ্চলে যেখানে তাঁর প্রতিপত্তি তখনও ছিল, তা হল বাদাকশান। বাবরকে তাঁর অশান্ত আফগান প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে বার্ষিক অভিযান চালাতে হত। এইভাবে আর্থিকভাবে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে ও উত্তরদিকে তাঁর সমস্ত পথ রোধ হওয়ায় ১৫১৫ সাল থেকে বাবর ভারতে আসার চেষ্টা করতে থাকেন। এখন দ(িণ দিকে ধন আহরণের চেষ্টা না করলে, তাঁর সৈন্যবাহিনী তিনি ধরে রাখতে পারতেন না।

ভারতবর্ষের অবস্থাও তাঁর প(কিছু কম লোভনীয় ছিল না। ঐ সময় ভারত কোনো ঐক্যবদ্ধ উপমহাদেশ ছিল না। ভারতের উত্তর অংশ একেবারেই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। চেঙ্গিস খানের ভারতে হানা শুধুমাত্র এর সীমানাকেই স্পর্শ করতে পেরেছিল, কিন্তু তৈমুরের ভারত আক্র(মণ ভারতে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। দিল্লী ও আগ্রার রাজত্ব এর পূর্ব গৌরবের ছায়ামাত্র হয়ে অবস্থান করছিল। সৈয়দরা এই অরাজকতা ও অবস্থানের মোকাবিলা না করতে পেরে লোদীদের উত্থানের পথ বিস্তৃত করেছিল। লোদী রাজত্ব ছিল অর্ধ স্বাধীন কিছু শাসনকর্তাদের এক ঢিলেঢালা জোট মাত্র। এই শাসনকর্তারা ছিলেন মুখ্যতঃ আফগান। লোদী বংশের প্রথম দুই লোদী ছিলেন দুর্ধষ ও বেপরোয়া প্রকৃতির আফগান। ইব্রাহিম লোদী অপরপ(নিজেকে আফগানদের সহানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলায় বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাঞ্জাব ও জৌনপুরে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং রাজপুতরাও তাদের পরাজিত করেন। কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য এলাকা ছিল রাজপরিবারের দ্বারা শাসিত অঞ্চল। অন্য এক আফগান রাজবংশ, শাহরা গুজরাটে রাজত্ব করতেন। বুলগাখানায় উল্লেখিত আছে বাংলায় হুসেন শাহী ও নসরৎ শাহী রাজবংশ প্রায় একটি স্বশাসন চালু করেছিল। আফগানরা নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না, এবং উপজাতীয় কলহের ফলে দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজপুতরা সাফল্যের সঙ্গে রাজত্ব করতেন। রাজপুতরা হুন, প্রতিহার ইত্যাদি গোষ্ঠীর একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য ছিল বলে কথিত আছে। নর্মদা নদীর দ(ণ অঞ্চল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত(ছিল। দু'টি গু(ত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল বিজয়নগর ও বাহমনী, তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন সূচিত করে। এর ফলে বিদর, খান্দেশ ও আহম্মদনগর নামে কিছু রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি দা(ণাত্যের মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হত। এদেরকে স্থানীয় শাসক ও মারাঠারা সাহায্য করতেন। যুগের প্রয়োজন মেটাবার মত শক্তি(শালী ছিল না লোদী বংশ। অর্ন্তকলহের ফলে জন্ম নেওয়া ষড়যন্ত্র দ্বারা পরো(ভাবে এবং আমন্ত্রণ দ্বারা প্রত্য(ভাবে ভারতে মুঘলদের ডেকে আনা হয়।

সামাজিকভাবে ভারত তখন কয়েকটি ধর্মীয়, জাতীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত(হয়ে পড়ে। এরা প্রত্যেকে নিজেদের আলাদা পরিচয় বজায় রাখতে চায় এবং তারা কখনই একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি(হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের সম্পদ মূলতঃ কৃষি ও হস্তশিল্পের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ভারতের সম্পদ না ছিল সমভাবে বন্টিত, না তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগান হত।

দুঃসাহসী বাবর একজন বিচ(ণ ও ধূর্ত পরিকল্পকও ছিলেন বটে। ১৫১৫-১৮, এই চার বছর তিনি কাবুল অঞ্চলে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উত্তর পশ্চিম সীমানায় নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা। তাই তিনি তাঁর এক পিতার দিকের ভাইয়ের মৃত্যুতে ১৫২০ সালে বাদাকশান দখল করেন। ১৫২২ সালে তিনি কান্দাহার দখল করেন। ফলে বালখ ও বাদাকশান তাঁর (মতার অধীনে চলে আসে। সুতরাং তাঁর হাতে গ্রামস্বী (Gramsvi) দেশগুলি চলে আসে। তিনি বালেখরা থেকে উজবেগদের বিতাড়ন করেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া ঐ অঞ্চলে তিনি একটি সমসাময়িক সামরিক কৌশল স্থাপন করেন। দুই তুর্কী গোলন্দাজবিদ উস্তাদ আলি ও মুস্তাফার সাহায্য লাভে স(ম হন। অল্পবয়স্ক হলেও তিনি সামরিক প্রশি(ণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। তাঁকে তাঁর জীবনে অসংখ্যবার নিজের মতই কোনো তুর্কী, মোঙ্গল, উজবেগ, পারসিক এবং আফগান প্রতিপ(র সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি চালাকির দ্বারা তাদের কিছু নিজস্ব যুদ্ধ ও সামরিক কৌশল তাদের থেকে শিখে নেন। উজবেগদের কাছ থেকে তিনি "তুলখামা" পদ্ধতি শেখেন। এর অর্থ ছিল শত্রুর সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ আত্র(মণ এবং একই সঙ্গে তাদেরকে অবি(শ্বাস্য গতিতে সামনে এবং পিছন থেকে আত্র(মণ করা। মোঙ্গল ও আফগানদের কাছ থেকে তিনি শেখেন "অ্যামবাসকেড" বা অর্তকিতে আত্র(মণ প্রণালী। এর সাহায্যে শত্রুকে বিপদের এলাকায় তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। ঐ এলাকাটি আগে থেকেই চিহ্নি(ত করা থাকত এবং সেখানে লোকজন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে ঘিরে রাখা হত। এরপর শত্রুর ওপর দুই দিক থেকে অর্তকিতে ঝাঁপিয়ে পড়া হত। পারসিকদের কাছ থেকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখেন এবং তাঁর তুর্কী আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি গতিশীল অশ্বারোহিনীর সঠিক প্রয়োগ শেখেন। এইভাবে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসায় একটি অতি উন্নত যুদ্ধকৌশল ও ব্যবস্থা বাবরের দখলে আসে। বেশ কিছু মধ্য এশিয়ার গোষ্ঠীর থেকে শেখা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের বিজ্ঞানসম্মত সং(-ষেরই ফল ছিল এই কৌশল। এই পদ্ধতি গতিশীল অশ্বারোহিনী, বিজ্ঞানসম্মত পদাতিকবাহিনী, অসাধারণ রণকৌশল ইত্যাদির সঠিক মিশ্রণ দ্বারা নিজস্ব চরিত্র লাভ করেছিল। যুদ্ধ(ত্রে সহিষ্ণু(তা, ধৈর্য, ঠান্ডা মেজাজ, মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যেই তাকে মানুষের এক বিচ(ণ নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এর ফলে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কখনও আশা হারাতেন না।

জন স্ট্রেমন্ড তাঁর "The formation of Mughal empire" গ্রন্থে বা(দ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মধ্যে বা(দই ছিল মুখ্য, গু(ত্বপূর্ণ এবং একমাত্র কারণ যা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইতিহাসবিদ মার্শাল, জি.এস. হজসন এবং উইলিয়াম. এইচ. ম্যাকনিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বকে মেনে নিয়েও এই মত ব্যক্ত(করেছেন যে আগ্নেয়াস্ত্র, বিশেষতঃ অবরোধনকারী কামানগুলি কেন্দ্রীয় শক্তি(র বৃদ্ধি করে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়েছিল। তাদের মতামতকে বা(দ সাম্রাজ্য তত্ত্ব" (Gunpowder empire thesis) হিসাবে বর্ণনা করা যায়। মুঘল বাহিনীর ওপর

রচিত ঐতিহাসিক সাহিত্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই তত্ত্বে যথেষ্ট আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সাহিত্যগুলি মুঘল বাহিনীর বর্ণনা করেছে অথচ মুঘল যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃত রাজনৈতিক গু(ত্ব বর্ণনা করেনি। সুতরাং এই প্রকল্পের বিবর্তন আলোচনা করতে গেলে, আমাদের শু(তেই কয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্ত(ব্য আলোচনা করতে হবে।

বিখ্যাত (শ প্রাচ্যবাদী ভি.ভি. বারটোল'ভ প্রথম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে মুঘল, অটোমান এবং সাফাভিদ সাম্রাজ্য তাদের পূর্বজদের ছাড়িয়ে আয়তন, কেন্দ্রিকতা এবং সময়ের ব্যাপ্তিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছিল শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্রের বিকাশ ও ব্যাপ্তির দ(ন। এই তিন সাম্রাজ্যের ওপর ভিত্তি করে হজসন এই প্রকল্পকে জোরদার করেছেন। তিনি ইসলামিক এই কর্মপ্রচেষ্টাকে—বা(দের ওপর গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য বলেছেন। ম্যাকনিল তাঁর "World Military History"-তে একে "(মতার নেশা" বলে বর্ণনা করেছেন। হজসন বলেছেন যে সেই আবিষ্কার যা বা(দ সাম্রাজ্যগুলি গড়ে তুলেছিল, তা শু(হয়েছিল প্রায় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন পশ্চিম ইউরোপীয় এবং অটোমানরা গোলন্দাজীকে প্রথমে অবরোধের (ে ত্রে ও পরে যুদ্ধ(ে ত্রে নির্ণায়ক অস্ত্র হিসাবে গড়ে তোলেন। ইসলামীয় জগতে অবরোধ এবং যুদ্ধের (ে ত্রে গোলন্দাজ বাহিনী বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায়। "গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপ্তিশীলতা এবং তার সামনে পাথরের দুর্গগুলির টিকে থাকার অ(মতা স্থানীয় সামরিক বাহিনীর চেয়ে এক অধিকতর সুবিধা এনে দিয়েছিল। ম্যাকনিল ষোড়শ শতকে এশিয়ার বৃহদ সাম্রাজ্যগুলির উত্থানকে আবিষ্কার চত্রে(র একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সামরিক নিবৃত্তির ফল হিসাবে দেখেছেন। আগ্নেয়াস্ত্র ও বিশেষতঃ অবরোধের (ে ত্রে গোলন্দাজ বাহিনী কেন্দ্রীয় শাসনকে এক গু(ত্বপূর্ণ সুবিধা দিতে স(ম হয়েছিল। এর ফলে তৎ(ণাৎ বা উপস্থিত পরিস্থিতির মোকাবিলা অনেক সহজতর হয়। ম্যাকনীল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নতুন বন্দুকগুলি আত্র(মণের দিকে অনেক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সেইরকম প্রত্যুত্তর সৃষ্টি করেনি। তবে সব ঐতিহাসিক হজসন ও ম্যাকনীলের সঙ্গে একমত হননি। অবরোধপন্থী যুদ্ধের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও নতুন লেখক ডাফি এই মন্তব্য করেছেন যে মুঘল যুগে দুর্গ নির্মাণের (ে ত্রে কোনো প্রযুক্তি(গত উন্নতি ঘটেনি যা ভারতীয় দুর্গকে ইউরোপীয়ান দুর্গগুলির সদৃশ করে তোলে। তবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে অবরোধের প(ে গোলন্দাজ বাহিনী মোটেও সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারেনি। মুঘলরা তাদের অবরোধ পরিকল্পনা প্রচুর অর্থ লগ্নী করে শু(করেন। দুর্গ নির্মাণ, ঘেরাও করার উপযোগী বৃত্ত নির্মাণ, দুর্গের চারিপাশে পরিখা ও খনি বা সুড়ঙ্গখনন ইত্যাদি পদ(ে প গ্রহণ করেন। গোলন্দাজবাহিনীর ধীর গতি সাম্রাজ্যের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ম্যাকনীল স্বীকার করেছেন জল যোগাযোগের ওপর নির্ভর না করার ফলে মুঘল শক্তি(বৃদ্ধি অনিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি(অবরোধ যুদ্ধে সাফল্য ও সুবিধা লাভ করায়, গোলন্দাজী বা দুর্গনির্মাণ কোনোটাই উন্নততর করে তোলা হয়নি।

বা(দ সাম্রাজ্যের এই প্রকল্প কাজেই এই মত প্রকাশ করে যে মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করা ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্র রাজকীয় কেন্দ্র ও প্রাদেশিক অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কই পুরো পাল্টে দেয়। এই নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমে যা সামরিক উদ্ভাবন ঘটেছিল, তার তুলনায় ভারতে অগ্রগতির ধারা (দ্ধ হয়ে যায়। এই প্রকল্প যদি সঠিক হত তাহলে আকবরের রাজত্বের প্রথম কয়েক বছর তিনি বিদ্যমান দুর্গগুলি ধ্বংস করে প্রদেশের (মতা দখলকারী শাসকদের তাদের শক্তি(ও স্বশাসনের অনেকটাই বিসর্জন দিতে বাধ্য করতেন। হাবিব ও ডাফির সমালোচনায় মনে হয় মুঘল গোলন্দাজ বাহিনী বিদ্যমান দুর্গগুলিকে সম্পূর্ণ অচল করতে পারেনি এবং যুদ্ধ(ে ত্রে মুঘলদের দ(তা তাদের অবরোধ যুদ্ধের (মতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গেছিল। কাজেই সামরিক কার্যকলাপের ধরণই এটা প্রমাণ করতে পারবে যে হজসন ও ম্যাকনীল না তাঁদের সমালোচকরা সঠিক।

পাণিপথ যুদ্ধের আগে বাবর কয়েকটি অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৫০৫ নাগাদ তিনি মূলতানের কিছু অংশ অধিকার করেন কিন্তু তিনি সিন্ধু নদী পেরোননি। ১৫০৭-এর মধ্যে আরও কয়েকবার হানা দেওয়া হয়েছিল। এবার তিনি মানদ্রাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে ফেরৎ চলে গেছিলেন। ১৫১৯ সালের শু(র দিকে তিনি ভারতে প্রথম অভিযান করেছিলেন।

এই অভিযান অশান্ত ও বিদ্রোহী ইউসুফজাই উপজাতির বি(দ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। এরা বন্দুকের মুখোমুখি না হলে কোনোভাবেই আনুগত্য স্বীকারে রাজী হত না। এদের উপযুক্ত(শাস্তি দিয়ে বাবর আরও এগিয়ে বাজাউর নামক জায়গায় প্রচন্ড আত্র(মণ চালান। এখানে এক কঠিন পরিস্থিতিতে তার গোলন্দাজ বাহিনী এক নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি আশেপাশের লোকেদের আতঙ্কিত করার জন্য বাজাউরের মানুষদের বাছবিচারহীনভাবে মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। এই অভিযানের যদিও কোনো সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল না। ১৫১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আবার ভারতের দিকে চোখ ফেরান। তিনি আফগান ইউসুফজাই উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। ১৫১৯ সালে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ভেরা দুর্গ বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫২০ সালে তিনি আবার ভেরায় একটি বিদ্রোহ দমন করেন, শিয়ালকোট পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং সৈয়দপুরে আত্র(মণ চালান। ১৫২৪ এ বাবর আরেকটি অভিযান চালান। লাহোর ও দীপালপুর দখল করেন। যদিও তিনি এই অভিযানগুলিতে সফল হন, তিনি তার সেনাপতিদের প্রজাদের উৎপীড়ন করতে বারণ করেন। তাই তিনি তৈমুর বা চেঙ্গিঁস খানের মত একজন আত্র(মণকারী ছিলেন না। তাঁর কাহিনী শুধুমাত্রই লুঠতরাজ ও ধ্বংসের কাহিনী নয়, শক্তি(বৃদ্ধিরও কাহিনী। তাঁর প্রাথমিক সাফল্যের পরে বাবর যেমন তার আত্মচরিতে লিখেছেন, পঞ্চম বারে হিন্দুস্তান বিজয় সম্পন্ন হয় ও হিন্দুস্তান তাঁর দখলে আসে।" পঞ্চম অভিযানে বাবর লোদী সুলতানদের অর্ন্তকলহের দ্বারা প্রত্য(ভাবে উপকৃত হন। এই ঘটনাই ১৫২৬ সালের ২১শে এপ্রিল পানিপথের যুদ্ধ ঘটায়, যা বাবরের নির্ণায়ক জয়ে সমাপ্ত হয়। ইব্রাহিম লোদী এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। বাবর মাত্র ২৪০০০ সৈন্য নিয়ে আসেন। আফগান বাহিনী অতি দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তারা যতই এগিয়ে আসে, তাদের বাহিনী ইতঃস্তত করতে থাকে এবং অপে(া করতে থাকে। এদিকে পেছনের সৈন্যদল সামনে এগিয়ে আসে। ফলে এক দা(ণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাবর এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁর একেবারে প্রান্তের দিকের সৈন্যরা আফগানদের ঘিরে ফেলে এবং সর্বপশ্চাৎ ভাগে এক ভয়ঙ্কর আত্র(মণ চালায়। অন্যদিকে তাঁর দ(িণ ও বাম বাহিনী ইব্রাহিমের সৈন্যদের উপর সোজা আত্র(মণ চালায়। ফলে তারা এগোবার বা পিছোবার কোনো পথ খুঁজে পায় না। না তারা নিজেদের অস্ত্রের কোনো সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। বাবরের অসাধারণ নেতৃত্ব, তাঁর রণকৌশল, তাঁর সৈন্যদের উন্নত অনুশাসন ও মনোবল এবং আফগান বাহিনীর অসন্তোষ এই সহজ বিজয়ের গুপ্ত কারণ। এই যুদ্ধ নির্ণায়ক যুদ্ধ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। লোদীদের সামরিক শক্তি(এর ফলে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে এবং স্বয়ং তাদের রাজা যুদ্ধ(ে ত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন। ভারতের তুর্কো-আফগান শাসকশ্রেণী (য়িযু(হয়ে ওঠে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিপদের সম্মুখীন হয়। উত্তর ভারতে বিজয়ের (ে ত্রে পানিপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তির সূচনা হয়। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লী ও আগ্রার রাজা হলেও, বাবরের প্রকৃত কাজ পানিপথের যুদ্ধের পরই শু(হয়। পানিপথের যুদ্ধ তাঁকে সেখানকার সার্বভৌমত্বের জন্য কার্যকরী দাবী তুলতে সাহায্য করে। পানিপথের এই যুদ্ধ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনো গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে স(ম হয়নি। আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, মুঘলরা দিল্লী ও আগ্রার বাইরে তাদের স্বশাসন স্থাপন করতে পারেননি। এইসময়েই আসলে সামরিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের প্রকৃতি বোঝা যায়। এটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা। এই যুদ্ধের পর আরও দু'টি যুদ্ধ হয়।

১) শোগরার যুদ্ধ (১৫২৭-২৮)— আফগানদের বি(দ্ধে অনুষ্ঠিত হয়। বাবর নিজে ভোপালের কাছে অবস্থিত বুন্দেলখন্ডের এবং মালবের সীমানায় চান্দেরী নামক একটি স্থান, যা বিখ্যাত রাজপুত শাসক মেদিনী রাইয়ের অধীনে ছিল, তাঁর বি(দ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই মেদিনী রাই মালব অঞ্চলে অন্যদের রাজা বানানোর (মতা অর্জন করেছিলেন। মুঘলরা তাঁকে অবরোধ করে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থান দখল করেন।

২) খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)— অনেক বেশী গু(ত্বপূর্ণ শত্রু ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ, যিনি ছিলেন ঐ সময়ের সবচেয়ে শক্তি(শালী রাজপুত রাজা। অনেক (দ্র রাজ্য তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তিনি

আশা করেছিলেন তৈমুরের মত বাবরও একজন হানাদার মাত্র এবং দিল্লীর সিংহাসন খালি পড়ে থাকবে। কিন্তু পানিপথের পরে বোঝা যায় বাবরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সংগ্রাম সিংহ তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানান। সুতরাং ১৫২৭ সালের ১৬ই মার্চ খানুয়া নামক স্থানে এক নির্ণায়ক যুদ্ধ শু(হয়। বাবর রাণার বি(দ্ধে এই যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) বলে ঘোষণা করেন এবং তাদের মনে করিয়ে দেন যে তিনি ধর্মের গৌরবের জন্য এই যুদ্ধ লড়ছেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। রাজপুতদের সামরিক শক্তি((তিগ্রস্ত হলেও তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। কিন্তু বিদেশী শাসনের বি(দ্ধে দাঁড়ানোর রাজপুত মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

বাবর সফলভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটান। বাবর একটি রাষ্ট্র স্থাপনা করেছিলেন এবং তিনি শুধুমাত্র একজন আত্র(মণকারী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর হুমায়ুনের অধীনে সাম্রাজ্যের সাময়িক পতনের জন্যও তিনি দায়ী নন। সুতরাং রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকলেও তিনি তা বাস্তবায়িত করার যথেষ্ট সময় পাননি।

এত সফল একজন যোদ্ধা ও বিজেতা হওয়া সত্ত্বেও বাবর একজন সাধারণ মানের প্রশাসক ছিলেন। তাঁর কোনো গঠনমূলক প্রতিভা ছিল না। তিনি সর্বত্রই পুরোনো ও যুগের তুলনায় পিছিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি কোনো নতুন ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে ঐগুলিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেননি। আসলে তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে তাঁর কার্যকলাপ ছিল ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নয়। তিনি তাঁর অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাঁর দলপতিও কর্মচারীদের সেগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইভাবেই সামরিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ওই অঞ্চলগুলি ছিল অর্ধস্বাধীন এবং একটিমাত্র বন্ধনে আবদ্ধ। সেই বন্ধনটি ছিল সম্রাট স্বয়ং। প্রত্যেক স্থানীয় শাসকের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল এবং তাঁর অঞ্চলে তিনি মানুষের দন্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন। সাম্রাজ্যের জন্য একই খবরের রাজস্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও বাবর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিচারব্যবস্থাও ছিল অবিন্যস্ত। সংখ্যার জটিলতা সম্বন্ধে কোনো গভীর ধারণা না থাকায় বাবর একজন অযোগ্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন।

আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বাবর বড়জোর একজন সাহিত্য ও সামরিক বিষয়ে দ(একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু একজন রাষ্ট্রনেতা ছিলেননা। তিনি তাঁর নিজস্ব চিহ্(সংবলিত কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেননি। তিনি আফগানিস্তান কিংবা ভারত, কোথাও সংস্কারও শু(করতে পারেননি। ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাঁর বিচার ছিল সঠিক যখন তিনি দায়িত্বশীল অভিজাতদের দেশের অবস্থা শান্ত করার কাজে লাগান। শাসনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বাবরের সরকার আগ্রা থেকে কাবুল পর্যন্ত পথ নির্মাণ করতে শু(করে। পনের মাইল অন্তর অন্তর তিনি সরাই নির্মাণ করতে শু(করেন। তাঁর নির্দেশে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। তিনি ডাক ব্যবস্থারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

বাবর কি করতে পারেননি তারা নিরীখে তাঁর বিচার করা ঠিক হবে না। বাবরকে লোকে ভয় পেত এবং শ্রদ্ধা করত এবং তিনি দরবারের নেতার সম্মান ভোগ করতেন। ভারতের অসংখ্য রাজ্যের মধ্যে তৎকালীন (মতার ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও নতুন ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়ে তিনি ভারতের পুরোনো মানচিত্রের বদল ঘটান। ইতিহাসে তাঁর প্রভাব বিশাল। তিনি যে প্রযুক্তি(ভারতে এনেছিলেন, তার ফলে ভারতে যুদ্ধের ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো ছাড়াও বাবর ভারতবর্ষকে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত(করেন।

বাবর সেই ভিত্তি স্থাপন করেন যার ওপর তার পৌত্ররা তাঁদের সাফল্য পেয়েছিল। মুঘল আত্র(মণ ছিল তৈমুর বা চেঙ্গিঁস খাঁয়ের আত্র(মণ থেকে আলাদা প্রকৃতির। তিনি এক নতুন ধরনের নীতি বলবৎ করেন যা লুঠতরাজ ও ধ্বংসের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। সুতরাং বাবর তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার দ(ণ এমন একটি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যা শুধু যুদ্ধের সময়ই কাজ করত। রাশব্রুক উইলিয়মসের মতে, "তিনি তাঁর পুত্রকে এমন একটি রাজতন্ত্র উত্তরাধিকার

সূত্রে দিয়ে গেছিলেন, যাকে একমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সাহায্যেই সংগঠিত রাখা যেত এবং যা শান্তির সময়ে দুর্বল, কাঠামোহীন ও মে(দন্ডহীন হয়ে যেত।" সুতরাং বাবর ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের কৃপতি ছিলেন না।

১.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসার ও বিস্তার

ইতিহাসের পাতায় বাবরের খ্যাতি মুখ্যতঃ তাঁর যুদ্ধজয়গুলির জন্য হলেও, তাঁর বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগ তাঁকে অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি ছিলেন একজন সুকবি ও চমৎকার গদ্যলেখক। অনুরূপভাবে তিনি তুর্কী ও ফার্সী এই দুটি ভাষাতেও পন্ডিত ছিলেন। তিনি প্রচুর রচনা করলেও, তাঁর গদ্য রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তুর্কীতে লেখা বাবরনামা বা বাবরের স্মৃতিকথা। এই বইয়ে তিনি খোলাখুলিভাবে এবং বিস্তৃতভাবে তাঁর জীবনের কাহিনী লিখেছেন। তাঁর লেখনীর সহজাত দ(তা ও তাঁর নিষ্ঠা রচনাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন লিখেছেন, "শৈলীটি হল সহজ ও পু(যালী, তথা জীবন্ত ও চিত্রবৎ। এটি তাঁর দেশের মানুষ ও সমসাময়িকদের হাবভাব, উপস্থিতি, কাজকর্ম, ল(্য ইত্যাদি আয়নার মত হুবহু তুলে ধরেছে। এই ব্যাপারে এটি এশিয়ার একমাত্র ঐতিহাসিক নমুনা। সাধারণ লেখকরা যদিও জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে থাকেন, তাঁরা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর লোকেদেরও জীবন ও আচার-আচরণ কেটেছেঁটে দেন। বাবর যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের চেহারা, পোশাক, (চি, অভ্যাসগুলি উপস্থাপনা করেছেন, তাতে মনে হয় আমরা যেন তাদের মধ্যেই রয়েছি, তাদের চিনি ও তাদের মতই চলি। ডঃ ঈ(রী প্রসাদের মতে, "আমরা যেমন যেমন এটি পড়ে যাই, তাঁর মধুর ব্যক্তি(ত্বের সম্মোহন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনের শক্তি(র একজন সুদ(সেনাপতি হিসাবে তী(ভাবে যুদ্ধপরিস্থিতি বুঝে নেবার (মতা—এই সবই আমরা অনুভব করতে পারি। প্রাচ্যের কোনো রাজাই বাবরের মত এক পুঙ্খানুপুঙ্খ, আকর্ষণীয় ও সত্যনিষ্ঠ রচনা রেখে যেতে পারেননি। স্যর ডেনিসন রস উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেছেন, "বাবরের স্মৃতিকথাকে চিরকালের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও রোমান্টিক রচনাবলীর মধ্যে অবশ্যই শ্রেণীভুক্ত(করা যায়।" প্রিঙ্গঁল কেনেডি বলেন, "বাবর এমন একটি আত্মজীবনী রেখে গেছেন যা প্রাচ্যের চিরকালের সবচেয়ে উজ্জ্বল আত্মচরিতগুলির মধ্যে একটি। স্ট্যানলি লেনপুনের বক্ত(ব্য, "বাবরের বংশের শক্তি(ও জাঁকজমক আজ আর নেই। তাঁর জীবনের কথা সময়কে পরিহাস করে আজও অপরিবর্তনীয় ও অ(য় রয়ে গেছে।"

বাবরের স্মৃতিকথা আকবরের আমলে ১৫৯০ সালে মির্জা আবদুর রহিম খান-ই-খানান ফার্সীতে অনুবাদ করেছেন। লেডেন ও আরস্কাইন ১৮২৬ সালে এটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। এটির একটি ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। যেখানে এই অনুবাদগুলি ফার্সী অনুবাদটির থেকে অনুদিত হয়েছে। মিসেস এ্যানেট সুসানাহ্ বেভেরিজ মূল তুর্কী বইটিরই একটি সংশোধিত ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর বক্ত(ব্য অনেক বেশী প্রামাণ্য ও বি(াসযোগ্য। "৮৯৯ সালের রমজান মাসে আমি ফরগানার রাজা হলাম।" এইভাবেই শু(হয়েছে বাবরের বিখ্যাত আত্মচরিত। এবং তিনি বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে লিখে গেছেন, "তাসখন্দ ও সেরিয়ান্সের মধ্যে ইয়েঘমা ও আরও অনেকগুলি ছোট গ্রাম আছে যেখানে ইব্রাহিম আতা আর ইশাক আতার সমাধি আছে। আমরা ঐ গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হলাম এবং কনিষ্ঠ খান কখন আসবে সঠিক না জানায়, আমি ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দেশটা দেখতে, তখন হঠাৎই আমি তাঁর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে অ(থেকে অবতরণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। যেই আমি এগোতে শু(করলাম খান আমাকে চেনার দ(ন অত্যন্ত বিব্রত হলেন। কেননা, তিনি অন্য কোথাও অবতরণ করে আমাকে সঠিক আদব-কায়দায় অভ্যর্থনা ও আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি এত দ্রুত নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম যে, উনি অনুষ্ঠানাদির কোনো সময়ই পেলেন না। আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁটু গেড়ে

বসে পড়লাম এবং তুষার এখন পর্যন্ত মাত্র দু-তিন মাইল জায়গাই দখল করতে পেরেছিল। আমি তুষারকে পায়ের চাপে পিষে ফেলতে সাহায্য করছিলাম। দশ পনের ঘর লোক ও কাশিম বেগও তাঁর পুত্রদের ও ভৃত্যদের সাথে আমরা সবাই ঘোড়া থেকে নেমে ও কষ্ট করে তুষার মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। প্রত্যেক পদ(েপে আমাদের কোমর বা বুক অবধি তুষারে ঢেকে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তুষারকে অগ্রাহ্য করে চললাম। কিছুটা এগোনর পর একটি লোক অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং অন্য একজন তার স্থান নিল।" এই পর্যবে(ণের স্পষ্টতায়, এই নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

তাঁর স্মৃতিকথায় বাবর তাঁর ব্যক্তি(গত অভিযান ও বাধাবিপত্তির বিস্তৃত বর্ণনার পাশাপাশি হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভারতে আসার পেছনে তাঁর নিজের দেশের অনৈক্য এবং পাঞ্জাব অধিপতি দৌলত খাঁ লোদী ও রাজপুতানার শাসক রাণা সঙ্গের আমন্ত্রণই সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পাণিপথের রণ(ক্ষেত্রে পৌঁছে বাবর দেখলেন ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যা অগুন্তি। প্রায় এক লাখ সৈন্যের কাছাকাছি, কিন্তু ত(ণ ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিটি পদ(েপে গাফিলতি, শৃঙ্খলাহীনভাবে অগ্রসর হওয়া, যেখানে সেখানে থেমে যাওয়া এবং কোনো দূরদৃষ্টি ছাড়াই লড়াই চালিয়ে যাবার ফলেই ইব্রাহিমের পরাজয় হয়। পানিপথের যুদ্ধে জয়ের জন্য বাবর সর্বশক্তি(মান ঈশ্বরের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কেন না ঈশ্বরই তাকে ভারতের মত একটি বিশাল দেশের বিজেতা বানিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "এই সাফল্যকে আমি আমার নিজের শক্তি(র ফল বা আমার উদ্যোগগুলির ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাপ্ত সৌভাগ্য মনে করি না। বরং ঈশ্বরের ক(ণাধারারই ফল মনে করি।" রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বাবর লিখেছেন, "ভারত সাম্রাজ্য হল সুবিশাল, জনবসতিপূর্ণ এবং ধনী। এর উত্তরে রয়েছে কাবুল, গজনী ও কান্দাহার। ভারতবর্ষের রাজধানী হল দিল্লী। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে লিখেছেন, "বাংলার এক অনন্য রীতি হল সেখানে রাজার জন্য একটি সিংহাসন আছে। একইভাবে প্রত্যেক আমীরের জন্যও একটি করে আসন র(িত আছে। ওই সিংহাসন এবং আসনগুলিই বাংলার মানুষের মনে শ্রদ্ধার স্থান দখল করে রয়েছে। কেউ যদি রাজাকে হত্যা করে তাঁর স্থানে নিজে বসে যেতে পারে, সেই তৎ(ণাৎ রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সমস্ত আমীর, উজীর, সৈন্যদল এবং কৃষককুল তাঁকে তৎ(ণাৎ তাদের আগের রাজার মতই মান্য করে ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। তাঁকেই তারা তখন তাদের সম্রাট মনে করে। ভারতবর্ষের মানুষ সম্বন্ধে বাবরের বক্ত(ব্য হল, "ভারতবর্ষে আনন্দ বা ফূর্তির অবকাশ কমই আছে। মানুষগুলি দেখতে সুন্দর নয়। তাদের না আছে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ সম্বন্ধে কোনো ধারণা, তারা না জানে মানুষের সঙ্গে মুক্ত(ভাবে মিশতে। তাদের কোনো সহজাত সৃজনীশক্তি(, সৌজন্যবোধ, দয়া ও সহমর্মিতা নেই। হাতের কাজ করার (ক্ষেত্রে কোনো দ(তা বা যান্ত্রিক উদ্ভাবনীশক্তি(বা স্থাপত্যে কোনো নক্সাজ্ঞান বা শৈলী নেই। তাদের কাছে নেই ভাল ঘোড়া, মাংস, আঙুর, খরমুজা, সুস্বাদু ফল, বরফ, ঠান্ডা জল, এমন কী তাদের বাজারে ভাল খাদ্য, (টি পাওয়া যায় না। কোন গোসলখানা, শি(া প্রতিষ্ঠান, কোনো মশাল, এমন কী একটা মোমবাতিও পাওয়া যায় না। মোমবাতি বা মশালের পরিবর্তে আছে একদল নোংরা লোক যারা দিহাতী বলে পরিচিত, বাঁ হাতে একটি তেপায়া বস্তু ধরে থাকে। এটি কাঠের হলেও আগের দিকটি লোহার তৈরী। সেখানে মধ্যম আঙুলের সমান একটি নমনীয় পলতে থাকে। ডান হাতে তারা একটি ফাঁপা লাউ ধরে থাকে। লাউয়ের মধ্যে ছিদ্র দিয়ে স(ধারায় তেল এসে পড়ে এবং পলতেটির যখনই তেল দরকার হয়, তেল এসে পড়ে। এইসব মহান লোকেরা একশ, দু'শ দিহাতী লোক রেখেছে শুধু এই কাজের জন্য।" তাঁর এই পর্যবে(ণ সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্ত(ব্য উত্তরের শেষ দিকে জানাব।

বাবরের প(সত্যই দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল যে শীতের দেশের বংশধর হয়ে তাকে গ্রীষ্মকালে ভারতে এসে পৌঁছতে হয়েছিল। দিল্লী, আগ্রার গরম তাঁর প(অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছেন, হিন্দুস্থানের তিনটি জিনিস আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি(কর লেগেছে। প্রথমটি হল গরম, অন্যটি হল এর জোর হাওয়া এবং তৃতীয়টি হল ধুলো।"

এর জন্য তিনি অভিযোগ করেছেন, "ভারতবর্ষের অন্যতম ত্রুটি হল কৃত্রিম জলধারার অভাব।" সুতরাং পরে তিনি তাঁর খবাজা খানকে লেখা একটি চিঠিতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, "ভারতে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই আমি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তোমাদের কাছে যাত্রা শু(করব। এ তো হতে পারে না যে ওইসব জায়গার আনন্দের স্মৃতি আমার মন থেকে একেবারে উঠে গেছে।"

অর্থনৈতিকভাবে এ দেশকে ধনী বলেই মনে হয়েছে বাবরের। শুধু ভূমি থেকেই আয় হত প্রায় ৪২১২০০০ টাকার মত, যা সমগ্র রাজস্বের এক অংশমাত্র পরাজিত ইব্রাহিম লোদীর কোষাগার থেকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন পান যা তিনি তার বন্ধু ও প্রিয় পাত্রদের মধ্যে দুহাতে মুক্ত(ভাবে বিতরণ করেন। তিনি শুধুমাত্র হুমায়ুনকেই সত্তর ল(টাকা দেন। ষাট হাজার থেকে এক ল(র কাছাকাছি টাকা তিনি আমীরদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি কাবুলের প্রতিটি অধিবাসীকে এক টাকা করে উপহার পাঠান। এই সমস্ত সম্পত্তি সাধারণ মানুষের (ুধা ও বঞ্চনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। বাবরের ভাষায় "নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও কৃষকেরা প্রায় নগ্নভাবেই দিন কাটায়। শালীনতা বজায় রাখার জন্য তারা নাভির দুবিঘৎ নীচে "লাঙ্গুটা" নামে বস্ত্রখন্ড পরে, দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কাপড় দিয়ে শক্ত(করে বেঁধে রাখত। মহিলারাও দু'খন্ড বস্ত্রের সাহায্যেই লজ্জা নিবারণ করত। একটি কোমরে জড়ানো থাকত। অন্যটি মাথার দিকে জড়িয়ে রাখত।

বাবর মানুষের কাজকর্মের সম্বন্ধেও লিখে গেছেন। "ভারতবর্ষের আরেকটি ভাল দিক হল এখানে সব ধরনের কাজের লোক অসংখ্য পরিমানে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধরনের কাজের একটি নির্ধারিত শ্রেণী আছে। এখনও পর্যন্ত পিতা থেকে পুত্র এইভাবেই উত্তরাধিকারসুত্রে কাজ শেখে।" বাবর ল(্য করেছেন যে তৈমুর বেগের প্রস্তর সমাধি নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে মোল্লা শরফ আজারবাইজান, ফারাস, হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দূর দেশ থেকে আগত মাত্র ২০০ জন কর্মীর কথা বলেছেন। অথচ শুধুমাত্র আগ্রাতেই বাবরের নিজস্ব গৃহনির্মাণে ৬৮০ জন এবং আগ্রা, সিক্রি(, বায়না, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র ও কয়েল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পাথর কাটার কাজে ১৪৯১ জন নিযুক্ত(আছে। একইভাবে বছরের সবসময়ই ভারতবর্ষের সর্বত্র সবধরনের অসংখ্য হস্তশিল্পী ও কর্মী পাওয়া যায়।" ভারতের ব্যবসার কথা লিখতে গিয়ে বাবর বলেছেন "দুটি প্রধান বাজারকেন্দ্র ছিল কাবুল এবং কান্দাহার। হিন্দুস্তান ও মধ্যে বিস্তৃত এই দেশটি পণ্যের চমৎকার বাজারের জন্য বিখ্যাত। হিন্দুস্তানের ম(যাত্রিরা প্রতিবছর পনের থেকে কুড়ি হাজার কাপড় নিয়ে আসে। হিন্দুস্তানের পণ্যসামগ্রী ছিল ত্রীতদাস, সাদা কাপড়, চিনির মিছরি, শোধিত এবং সাধারণ চিনি, ওষুধ এবং মশলাপাতি। ভারতীয় বণিকরা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা এবং রূপা আহরণ করত।

১.৪ বাবরের ভারত পর্যালোচনার সত্যতা

বাবরের বক্ত(ব্যের অকপটতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় ভারতের প্রতি বৈরিতা বা অপছন্দের জের টেনে কোনো বক্ত(ব্য রাখেননি। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ অবশ্য মনে করেন, "ভারতের মানুষজনের প্রতি বাবরের খারাপ মনোভাব যা প্রকাশ পেয়েছে তা অনেকটাই অতিরঞ্জিত। এর কারণ বাবর এদেশের মানুষদের ভাবনাচিন্তা, অভ্যাস ও স্বভাব ঠিকভাবে ও পুরোপুরি চেনার জন্য যত সময় প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম সময়ই এদেশে কাটিয়েছেন। (A short History of Muslim Rule in India, 1939, page 228) ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে, "প্রথমে তাঁর মনোভাব বিজিতের প্রতি বিজয়ীর যে হেয় মনোভাব হয় তাই ছিল।" (Mughal Empire 1957 page 33) বাবর নিজেও লিখে গেছেন, "আমি যখন আগ্রায় পৌঁছলাম তখন সেটা গরমকাল। সমস্ত লোক ভয়ের চোটে পালিয়েছে। আমরা নিজেদের জন্য কোনো খাদ্যকণা কিংবা ঘোড়াগুলোর জন্য খড়কুটো বা জাবনা কিছুই পেলাম না। গ্রামের লোকেরা বৈরিতা বা ঘৃণার থেকে বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। এমনকি চুরি-ডাকাতিও

শু(করেছে।" এই যদি মুখ্য নগরী আগ্রার আশেপাশের এলাকার অবস্থা হয়, তবে বাকী দেশের অন্যান্য অংশের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। তাই বাবর যদি আত্র(মণকারীর প্রতি দেশের লোকের অভদ্র আচরণ বা বাজারে সুখাদ্যের অভাবের জন্য যদি দুঃখপ্রকাশ করে থাকেন তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। তবে তিনি ভাল কথাও লিখে গেছেন। "হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভাল দিক হল এই সুবিশাল দেশে প্রচুর সোনা রূপা পাওয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে আবহাওয়া খুবই মনোরম। কোনো কোনো দিন দশ, পনের এমনকী কুড়ি বারও বৃষ্টি পড়ে। বর্ষায় হঠাৎই নদী ছাড়িয়ে চারদিক ভাসিয়ে প্লাবন আসে। এমন কী সেইসব জায়গাতেও যেখানে অন্যসময় কোনো জল থাকে না। যখন মাটিতে বৃষ্টি নেমে আসে তখন মৃদু এবং মনোরম উষ(তা বয়ে আনা বাতাসের চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছুই নেই। খবাজা খাঁ দিল্লী ছেড়ে আফগানিস্তান যাবার সময় এই ছত্রটি লিখে গেছিলেন ঃ "যদি আমি নি(পদ্রবে, নিরাপদে সিন্ধ পেরিয়ে যাই, আমি কোনোমতেই ভারতের কথা আর ভাবব না।" বাবর তাঁকে উত্তর পাঠিয়েছিলেন এইরকম ঃ Return a hundred thank, O Babar, for the bounty of merciful God has given you Sind, Hind and numerous kingdoms. If unable to stand the heat, you long for cold. You have only to recollect the frost and cold of Ghazni. "হে বাবর, দয়ালু ঈ(্বরের ক(ণার জন্য তাঁকে শত ধন্যবাদ জানাও। তোমাকে সিন্দ, হিন্দ ও অন্যান্য রাজ্য যিনি দিয়েছেন। যদি গরম না সহ্য করতে পার, শীতের জন্য প্রার্থনা কর। এখন গজনীর কুয়াশা আর ঠান্ডা মনে করা ছাড়া তোমার কিছুই করার নেই।"

সুতরাং বোঝা যায় যে, বাবর যা দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেই সব স্বাভাবিক আবেগই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর লেখনীতে স্থান পেয়েছে। প্রিঙ্গল কেনেডির সাথে আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিত "তাঁর সম্বন্ধে আর যে যাই ভাবুক না কেন, এই হাসিখুশী, সুরসিক, প্রকান্ড মানুষটির প্রতি গভীর ভালবাসা না রেখে পারবে না, যিনি তাঁর দুর্বলতাগুলি লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেননি, নিজেকে কোনোভাবেই সাধারণ মানবজাতির চেয়ে উন্নততর প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি।"

১.৫ হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুর তিনদিন পরে ২৯ ডিসেম্বর ১৫৩০ এ উৎসব ও আনন্দোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে হুমায়ুন আগ্রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যন্ত সু(চির সঙ্গে উদ্‌যাপিত এই অনুষ্ঠানে নৌকাভর্ত্তি সোনা বিতরণ করা হয়েছিল। তাঁদের পূর্ব ইতিহাস যাই হোক না কেন অবিচ্ছেদ্য আনুগত্যের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পেলেন স্বপদে নিযুক্ত(থাকার আ(্বাস। এই ত(ণ, বীর রাজপুত্র তখন বুঝতে পারেননি, যে সিংহাসন তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেন তা টিকিয়ে রাখা সহজ হবে না। যখন বাবর বুঝতে পারলেন যে তাঁর অসুস্থতার কোনো প্রতিকার সম্ভব নয় এবং তাঁর মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তিনি তাঁর সমস্ত অভিজাতদের ডেকে হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করতে এবং শাসনকার্যে তাঁকে সমস্তরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। স্বয়ং হুমায়ুনকে তিনি বলে যান ঃ "আমি ঈ(্বরের কাছে তোমাকে, তোমার ভাইদের, আমার জ্ঞাতিবর্গ, আমার প্রজা ও তোমার প্রজাদের রেখে গেলাম। এদের সবার জন্য আমি তোমার ওপর ভরসা রাখি।"

তিনদিন বাদে বাবর তাঁর শেষনিঃ(্বাস ত্যাগ করেন। একজন বাধ্য ছেলের মত হুমায়ুন পিতার আদেশ কখনই অমান্য করেননি, যার ফলে তাঁর প্রচুর (তি হয়েছিল। তাঁর তিন ভাই এবং দুই জ্ঞাতি ভাই যারা তাঁর বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ কদাচিৎই ছাড়তেন, তাদেরকেও তিনি বাবরের বিজিত অঞ্চলের বড় অংশ ছেড়ে দেন। কাবুল ও কান্দাহারে কামরান তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন। আসকারি পান সম্ভল এবং হিন্দলকে দেওয়া হয় আলওয়ার ও মীরাট। বাদাকশান দেওয়া হয়েছিল সুলেমান মির্জাকে। বাবরের কন্যা মাসুমা বেগমের স্বামী মহম্মদ জামান মির্জাকে

জৌনপুরের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। সাম্রাজ্যের এই অবাধ বিভাজন কেন্দ্রীয় শক্তি(কে দুর্বল করে তুলেছিল এবং সাম্রাজ্যকেও দুর্বল করেছিল। অবশ্য এ(ত্রে ডঃ ত্রিপাঠীর মন্তব্য গু(ত্বপূর্ণ। হুমায়ুন তুর্কো-মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী তাঁর ভাইদের সঙ্গে সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। কেননা এর অন্যথায় তাঁর প(অসুবিধার সূচনা হতে পারত। কারণ যাই হোক না কেন, একটা কথা খুবই পরিস্কার। ভারতবর্ষের সীমানার বাইরের অঞ্চলগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মুঘল সৈন্যবাহিনীর মূল নিয়োগ(ত্রকে খুইয়ে ফেলেন। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানের পাহাড়ী উপজাতি বা অস্কাসের লোকেরা শক্তি(যোগাত ও তা বজায় রাখত। কিন্তু এখন ঐ উৎসগুলিকেই হুমায়ুন ধ্বংস করে ফেলেন। এরপরে হুমায়ুনকে ভারতবর্ষের বিলাসবহুল জীবনযাপন ও (তিকারকজলবায়ুর শিকার এক (য়িষু(সৈন্যবাহিনীর উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

প্রফেসর উইলিয়ম রাশব্রুক লিখেছেন, "বাবর তার পুত্রকে এমন একটি রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী করে গেছিলেন যা বিরামহীন যুদ্ধ পরিস্থিতিতেই শক্ত(করে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল এবং শান্তির সময় দুর্বল, মে(দন্ডহীন এবং অসংগঠিত হয়ে পড়ত। প্রকৃতপ(বাবর যথেষ্ট সময় পেতেন তার সাম্রাজ্যকে সুসংসত করে তুলতে যদি তিনি এক কার্যকর শাসনব্যবস্থা স্থাপনে আগ্রহী হতেন। তিনি একজন অচেনা বা বিদেশী হয়ে এ দেশে ঢুকলেও শাসক ইব্রাহিম লোদীকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেকে হিন্দুস্তানের বাদশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি ১৫২৭ সালে রাণা সঙ্গের নেতৃত্বাধীন রাজপুত্র জোটকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইব্রাহিম লোদীর অন্য এক ভাই মাহমুদ লোদীকেও ১৫২৯ সালে ঘাঘরার যুদ্ধে অপমানজনকভাবে পরাজিত করেন। বাবরের প(এগুলি ছিল অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বিজয় হলেও তার শত্রুরা এর ফলে নিশ্চিহ(বা ধ্বংস হয়ে যায়নি। যদিও মুঘলদের বি(দ্ধে রাজপুত প্রতিরোধের মে(দন্ড ভেঙে পড়েছিল, তবুও রাজপুতরা এখনও শত্রুভাবাপন্ন ছিল। আফগানরাও মুঘলদের কাছে (মতা হস্তান্তরের বোঝাপড়ায় রাজী হয়নি এবং তাদের হারানো ভাগ্য ফিরে পেতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাদের আরও একটা সুবিধের দিক ছিল যে তারা অপসারিত রাজবংশের বংশধর মাহমুদ লোদিকে পেয়েছিল। তাকে সমস্ত আফগান অভিজাতরাই সমর্থন করতে রাজী ছিলেন। বাংলা ও বিহারে ইতিমধ্যেই শেরখান অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং মুঘল শক্তি(কে সরিয়ে আফগান শক্তি(র পুন(জ্জীবনের চেষ্টা করছিলেন। "যদি ভাগ্য আমার সহায় হয়, আমি হিন্দুস্তান থেকে মুঘলদের তাড়িয়ে দিতে পারি। তারা যুদ্ধ(ত্রে আমাদের চেয়ে মোটেও উন্নততর নয়।" দ(ণেও ত(ণ, উচ্চাকাঙ্খী ও যুদ্ধপ্রিয় বাহাদুর শাহ তার (মতা ও প্রতিপত্তি প্রচুর বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। গুজরাট এবং মালবের উপরেও তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। দ(ণে অনেক দুর্বল শাসকের কাছে তিনি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজপুতানা জয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন। ডঃ ত্রিপাঠী মনে করেন উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ত্র(মশঃ শক্তি(শালী হয়ে উঠছিলেন এবং আইনানুগ সম্রাট না হলেও তিনি কার্যত সম্রাটের ভূমিকাই পালন করছিলেন। এই বক্ত(ব্য আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে এবং এই বক্ত(ব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রবল শক্তি(শালী প্রতিপ(বিশেষতঃ বাহাদুর শাহ এবং শের খানের সামনে হুমায়ুনের খুব কিছু করার ছিল না। বাবরের ব্যাপক ধনবন্টনের কল্যাণে কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে আর্থিক ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের সীমানা আমু নদী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের অনেক দূরবর্তী অঞ্চল যেমন গজনী, কান্দাহার ছাড়াও মূলতান, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা ইত্যাদিও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই বিশালতা সত্ত্বেও এটি না ছিল সুসংবদ্ধ, না ছিল সুশাসিত। বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেও কোনো সমতা ছিল না। আরস্কাইন লিখেছেন, "প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি জেলা এবং প্রায় প্রতিটি গ্রাম সাধারণ ব্যাপারে একান্ত নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করত। দেওয়ানী, ফৌজদারী এমনকি প্রাণদন্ডের (ত্রেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যথাযথ শৃঙ্খলা ও সংযমের সাথে সিদ্ধান্ত নিতেন না।" এইসব কারণেই শাসক রাজবংশের প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আনুগত্য তো ছিলই না, বরং তারা সদাযুদ্ধরত আফগান, মুঘল, তুর্কী, পার্সিয়ান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর

অবিরাম চলাচলে ত্রু(দ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এইসব বিভিন্ন জাতির সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন উপজাতীয় সর্দারের অধীনে থাকত এবং তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি খুব দুর্লভ দৃশ্য ছিল না। তারা একে অপরের বি(দ্ধে প্রায়ই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত। সুতরাং ল(্য করা যায় সৈন্যবাহিনী একই শ্রেণীভুক্ত(বা শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল না। তাই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করা যেত না।

একটি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজার বীরত্ব ও বিচ(ণতার দ্বারাই জাতির নিয়তি নির্দ্ধারিত হয়। হুমায়ুন যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার চারপাশে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান করা খুব সহজ ছিল না। তবুও আমরা যদি বাবর কিংবা আকবরের অল্পবয়স ও তাঁদের সমস্যাসঙ্কুলতার সঙ্গে হুমায়ুনের তুলনা করি, তবে আমরা হুমায়ুনের কথা ভেবে হতাশ হই না। হুমায়ুন বাবরের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছিলেন, আকবরের জন্য তিনি তার থেকে বেশী কিছু রেখে যেতে পারেননি। বাবরেরও প্রথম জীবনে সব কিছুই তাঁর প(সহজ ছিল না। তিনি মাত্র বার বছর বয়সে ফরগনার অধিপতি হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যপাট হারিয়ে ভবঘুরের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমস্যা ও তার সমাধানই একটি মানুষকে সম্পূর্ণতা দান করে। হুমায়ুনের সমস্যাগুলিও অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ছিল না। একথা সত্যি, "সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি স্পষ্ট বুঝবার ও তার দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় অসম্ভব শক্তি(ও যুদ্ধে অসাধারণ দ(তা জ(রী ছিল।" বাবর একবার হুমায়ুনকে লিখেও পাঠিয়েছিলেন ঃ

"এই পৃথিবী তারই যে (মতার জোরে কেড়ে নিতে পারে। সংকট দেখা দিলে নিজেকে খাটিয়ে নিতে ভুলো না। রাজত্ব করতে হলে আলস্য এবং আরাম চলবে না।"

কিন্তু হুমায়ুনের এত সব গুণ ছিল না। তিনি নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন। তিনি বড়ই আরামপ্রিয় এবং অসংযত ছিলেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন, "তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতেন। যখন ি(প্রতার সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন তখন তিনি দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করতেন। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। প্রকৃতির শুভ-অশুভ ল(ণ বিচার না করে কোনো গু(ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।" লেনপুন মন্তব্য করেছেন, "তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও সংকল্পের অভাব ছিল। তিনি নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এক মুহূর্তের বিজয়ের পরেই আরামে ও আফিম সেবন করে নেশার ঘোরে ডুবে যেতেন। অথচ তার শত্রুরা তখন প্রায় তাঁর দরজায় এসে হানা দিচ্ছে। যখন শাস্তি দেবার কথা তখন তিনি (মা করে দিতেন।

তাঁর চরিত্র আকর্ষণ করত কিন্তু কখনই তা শাসন করত না। তাঁর ব্যক্তি(গত জীবনে হয়তো তিনি মনের মত সঙ্গী ও একনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি ব্যর্থ।" হুমায়ুনের পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত অঞ্চলের অধিকার হারানো এবং ফিরে পাওয়ার ইতিহাস বাবরের অভিযানগুলির মতই চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ।

রাজত্বের শু(র দিকে হুমায়ুন যুদ্ধে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাগ্যও এই ত(ণ রাজার সহায় হয়েছিল। তাঁর জীবনের প্রথম অভিযান হয়েছিল বুন্দেলখন্ডের কালিঞ্জর দুর্গে। সন্দেহ করা হয়েছিল যে রাজা আফগানদের সঙ্গে বাদশার বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। হুমায়ুন কয়েকমাস দুর্গ অবরোধ করে রাখলেও দুর্গটিকে জয় করা সম্ভব হয়নি। তবু তিনি এই সূত্রে প্রচুর (তিপূরণ পেয়েছিলেন। তিনি এবার আফগান ষড়যন্ত্রের অপর একটি ঘাঁটি দখল করতে উদ্যোগী হন। জৌনপুরে মাহমুদ লোদীর অধীনে আফগানরা বারাবাঙ্কি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তিনি তখন শের খানের এক প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি চুনার দখল করে নেন কিন্তু শের খানের তরফ থেকে সম্পূর্ণ দায়সারা ভাবে আত্মসর্মপণ করা হলে তিনি ওই অবরোধ তুলে নেন। ভবিষ্যতে এর ফল হুমায়ুনের প(ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কেননা এই শের খানই একদিন মুঘলদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন।

হুমায়ুন তাঁর রাজত্বের শু(র দিকে গুজরাট ও মালবের উচ্চাকাঙ্ী শাসক বাহাদুর শাহের সঙ্গে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। সত্যি কথা বলতে কি, বাহাদুর শাহ বাদশার বিরক্তি(উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন

তিনি মুঘলদের দুই পলাতক প্রতিপ(মহম্মদ জামান মির্জা অর্থাৎ বাবরের জামাতা এবং আলম খান-আজনা-উদ-দিন লোদী নামে এক আফগানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই আলম খান লোদী নামক আফগান মুঘল সিংহাসনের প্রতি লালায়িত ছিলেন। যাই হোক বাহাদুর শাহ এই পলাতকদ্বয়কে মুঘলদের কাছে হস্তান্তর করতে বা গুজরাট থেকে বিতাড়ন করতে আগ্রহী ছিলেন না। এই কারণে হুমায়ুন এবার বাহাদুর শাহকে শায়েস্তা করতে ১৫৩৪ সালে মালবে উপস্থিত হলেন। এইবারে হুমায়ুন ভুল বিবেচনার শিকার হলেন। কেননা বাহাদুর শাহ ঐ সময় চিতোর দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, চিতোরের রাণী কর্ণবতী হুমায়ুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন যদি সামান্যও বিবেচনা করতেন, তবে তিনি কর্ণবতীর আবেদনে সাড়া দিতেন কেননা বাহাদুর শাহ ছিলেন দু'প(রই শত্রু। হুমায়ুন চিতোরের দিকে যাত্রাও শু(করেছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ বিধর্মীদের বি(দ্ধে পবিত্র ইসলামিক যুদ্ধে নিরত থাকার দোহাই দিয়ে হুমায়ুনকে যুদ্ধ শু(র থেকে বিরত রাখেন। সম্রাটের দিক থেকে এটি একটি বড় ধরনের ভুল ছিল। রাজপুত সাহায্য পাবার ও তাঁর নিজের সবচেয়ে শক্তি(শালী শত্রুকে বিনাশ করার এক সুবর্ণ সুযোগ তিনি এর ফলে হারালেন।

চিতোরের পতনের পরে মান্দাসোর নামে এক কৃত্রিম জলাশয়ের পাশে মুঘল বাহিনী ও বাহাদুর শাহের মধ্যে সম্মুখসমর শু(হল। বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়ে মান্ডু দুর্গে আশ্রয় নেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে ধাওয়া করে দুর্গটিকে অবরোধ করেন। ভাগ্যও হুমায়ুনের সহায় হয়েছিল। ফলে মুঘলরা দুর্গটি দখল করতে স(ম হয়। বাহাদুর শাহ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী তাঁর পিছনে ছায়ার মত লেগে রইল, যত(ণ না বাহাদুর শাহ মান্ডু থেকে চম্পানীর, পরে আমেদাবাদ ও কাম্বে হয়ে দিউয়ে আশ্রয় নিলেন। গুজরাট বিজয় ১৫৩৫ এর অগাস্ট মাসে সম্পূর্ণ হয়। এর ফলে হুমায়ুন তাঁর বাকী সাম্রাজ্যের প্রায় সমান আয়তনের মালব ও গুজরাটের অধিকার পান। কিন্তু তাঁর বিজিত অঞ্চলগুলিকে সংহত না করে বা সুদ(শাসনব্যবস্থা কায়েম না করে, এই মূল্যবান সময় তিনি শুধুই আনন্দ উৎসবে নষ্ট করেন। এর ফল হল এই যে, যেইমাত্র তিনি আগ্রা ছেড়ে বেরিয়ে শের খানকে মোকাবিলা করতে যান, বাহাদুর শাহ তাঁর সমস্ত অঞ্চল পুন(দ্ধার করেন। লেনপুন লিখেছেন, "এক বছরে দু'টি বৃহৎ প্রদেশ দ্রুত জয় করা হোল, পরের বছরই ঐ দু'টি প্রদেশ ততটাই দ্রুত হারিয়ে গেল।" এইভাবে গুজরাট বিজয় এক হতাশাজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এর পরে হুমায়ুনের কাজ ছিল তাঁর প্রধান শত্রু শের খানের মোকাবিলা করা। ইতিমধ্যেই গুজরাটে হুমায়ুনের অনুপস্থিতির সুযোগে শের খান তাঁর অবস্থাকে সুসংহত করে ফেলেন এবং বাংলার রাজাকে পরাজিত করেন। গুজরাট থেকে আগ্রায় ফিরে হুমায়ুন তখনই বিদ্রোহের (ে ত্রে না পৌঁছে পুরো এক বছর আনন্দ করায় ব্যস্ত রইলেন। অবশেষে ১৫৩৭-এর শেষের দিকে যখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ত জীবনের তন্দ্রার ঘোর থেকে উঠলেন, তখনও তিনি সোজা গৌড়ের দিকে না গিয়ে চুনার দুর্গ ঘিরে ফেললেন। বাংলার রাজার সাথে এদিকে ততদিনে শের খান চুক্তি(তে আবদ্ধ হয়েছেন। এদিকে চুনার দুর্গের সাহসী যোদ্ধারা টানা ছয় মাস ধরে মুঘল সৈন্যদের বি(দ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সময়ের মধ্যে শের খান গৌড় দখল করে নিয়ে মুঘলদের মোকাবিলা করার প(উপযুক্ত(হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে হুমায়ুন চুনার দুর্গ দখল করে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন এবং সহজেই বাংলা দখল করলেন। কিন্তু যথারীতি সম্রাট তাঁর দূরদৃষ্টির অভাবে এই সুযোগও কাজে লাগাতে পারলেন না। কেননা তখনই তিনি শের খানকে জব্দ না করে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ করে গৌড়ে ছয় মাস কাটালেন এবং গৌড়ের নতুন নামকরণ করলেন জান্নাতাবাদ (স্বর্গের শহর)। ইতিমধ্যে শের খান বিহারে নিজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটান এবং কনৌজ পর্যন্ত মুঘল এলাকা দখল করে নেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আগ্রায় ফেরা মনস্থির করলেন। ততদিনে জোরদার বৃষ্টি শু(হয়ে গেছিল এবং তার ফলে সৃষ্ট বন্যা সম্রাটের যোগাযোগের (ে ত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে জিনিসপত্রের সরবরাহের অভাব দেখা দিয়েছিল এবং বহুদিন বসে থাকার ফলে সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আগ্রায় ফেরত যাবার সময় অর্তকিতে আফগান সৈন্যরা সম্রাটের বাহিনীকে আত্র(মণ করলে তা বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অনেক

সৈন্য ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রাণ দেয় এবং খুব কম সংখ্যক সৈন্যই ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পায়। স্বয়ং সম্রাটকেও বেপরোয়াভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। পরে একটি জলযানে চড়ে তিনি অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচান। অভাগা এই সম্রাট সম্পূর্ণ একা আগ্রায় পৌঁছন এবং রাজকীয় হারেমের মহিলাদের পরে আফগান সেনারা আগ্রায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়। এত বিশাল পতন ভারতীয় ইতিহাসে খুবই বিরল।

আফগান ও মুঘল সৈন্যের অন্তিম সম্মুখসমর হয়েছিল ১৫৪০ সালের মে মাসে কনৌজের যুদ্ধ(ত্রে । হুমায়ুন পুরো একবছর সময় ধরে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পুর্নগঠন করেন এবং এক ল(সৈন্য জোগাড় করেন। কিন্তু আগে থেকেই শিথিল ও অসংহত মুঘল বাহিনীকে ত্যাগ করে সৈন্যরা ত্র(মাগতঃ চলে যাওয়ায় বাহিনী আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোনো চেষ্টা ছাড়াই মুঘল বাহিনী ভীত হয়ে পড়ে এবং সহজেই আফগানদের কাছে পরাজিত হয়। সবাই গঙ্গা নদীর দিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলে সেতু ভেঙে পড়ে। হুমায়ুন খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এর পরে পনের বছর তিনি ভবঘুরের জীবন কাটান। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর অপদার্থ ছেলেদের অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে হুমায়ুন ভারত আত্র(মণ করেন এবং ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুন(দ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে মাত্র কয়েক মাসের বেশী সিংহাসন ভোগ করা ছিল না। ১৫৫৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী দিল্লীতে পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ৪৮ বছরেরও কম বয়সে মারা যান। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ২৫ বছর ভারতে রাজত্ব করেন। বাবর যে অনিশ্চিত মুঘল বংশের বীজ বপন করেছিলেন, হুমায়ুনের উচিত ছিল তাকে শক্তি(শালী করে তোলা। কিন্তু কয়েকটি কারণে, প্রতিকূল অবস্থা ও তাঁর নিজের ভুলের জন্য তিনি বিপাকে পড়েছিলেন, যার ফলে তাকে এক রাজকীয় ভবঘুরের জীবন কাটাতে হয়েছিল প্রায় পনের বছর। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, "একজন মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে, তার ওপরেই তাঁর স্বভাব অনেকটা নির্ভর করে। যত(ণ না আমরা তাঁর অসুবিধা, এবং মধ্যযুগীয় নৃপতিসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সুবিধাভাবে বিবেচনা না করি, তখন তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।"

রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের সাফল্যের জন্য অনেকাংশে সৌভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, যা হুমায়ুনের ে(ত্রে ঘটেনি। কর্তব্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আত্মীয়তার প্রতি সম্মান যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একজন রাজার স্বাভাবিক আচরণবিধি যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি(র মত হতে পারে না। তাঁর আচরণের ধরণের কোনও পরিবর্তন না করায় হুমায়ুনের প্রচুর (তি হয়েছিল। তিনি যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছিলেন এবং তাঁর যে সমস্ত ত্রুটি ছিল, তার ফলে ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। তাঁর যে ত্রুটি তার উদ্যমের ে(ত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা হল সহজাত সদ্‌গুণ এবং তাঁর অসীম (মাশীলতা দেশে ঐক্য বজায় রাখার জন্য তিনি শত্রুর অনেক দোষ-ত্রুটি অগ্রাহ্য করে যেতেন। তাঁর কিছু গুণই তাঁর বিপর্যয় ডেকে আনে। তাসত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে কঠিন অবস্থাতেও আশা হারাননি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সিংহাসন পুন(দ্ধার করতে স(ম হন। তাঁর নির্বাসন থেকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরলেন। এর পর তিনি অনেক শক্ত(, সত্রি(য় বা বাস্তববোধসম্পন্ন হয়ে ফিরলেন। যদি আমরা খুঁটিয়ে হুমায়ুনের রাজত্বের ঘটনাবলী বিচার করি, তবে অবশ্যম্ভাবী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছব, যে হুমায়ুন যত না অযোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যপীড়িত। তাঁর দৈহিক শক্তি(কিছু কম ছিল না এবং যুদ্ধ(ত্রে তিনি নিজের (মতার সুপরিচয় দিয়েছেন। এলফিনস্টোনের বক্ত(ব্য, "সংকটের সময় হুমায়ুন কখনই পিছিয়ে পড়তেন না। সহজ ও আরামের জীবনের প্রতি তাঁর টান থাকলেও চাপ ও টানটান পরিস্থিতিতে তিনি অদম্য ইচ্ছাশক্তি(ও কর্ম(মতার পরিচয় দিয়েছেন। সংকটের সময় তিনি দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তাঁর অভীষ্ট ল(্যে পৌঁছে যেতেন। কিন্তু যেইমাত্র কিছু লাভ করতেন তখনই সেটা হারিয়ে ফেলতেন। লেনপুন লিখেছেন, "যদি পড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা থাকত, হুমায়ুন কখনই তা হারাতেন না। উনি সারাজীবন ধরেই হোঁচট খেলেন এবং মারাও গেলেন হোঁচট খেয়েই। রাজা হিসাবে শেষ পর্যন্ত যদি তিনি ব্যর্থ হয়ে থাকেন, এই ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের।"

একক ২ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার এবং মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠতা

মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বাবরের ভারত আগমন খুবই গু(ত্বপূর্ণ। প্রথম মুঘল সম্রাট ভারতবর্ষে নতুন ধরনের যুদ্ধকৌশল চালু করেন। যদিও ভারতে এর আগেই বা(দের প্রচলন ছিল। তবু দ(গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীর যৌথ উদ্যোগ কী অর্জন করতে পারে তা বাবর প্রথমবার দেখালেন। তাঁর বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে দ্রুত বা(দ ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করল। কিন্তু ১৫৪০ সালে হুমায়ুন তাঁর সাম্রাজ্য হারালেন।

হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল আফগান দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মুঘল যুদ্ধকৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৫৬ সালে আকবর ও আফগান শাসক আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে এই শ্রেষ্ঠত্বের কথাই আবার প্রমাণিত হয়। হিমু ধৃত হন ও তাঁকে আকবর শাস্তি প্রদান করেন। এর পরে আকবর তাঁর পিতা ও পিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল পুর্নদখল করেন।

গোড়ার দিকের সাম্রাজ্য বিস্তার (১৫৫৬-৭৬) ঃ

বৈরাম খানের অভিভাবকত্বাধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আজমীর বাদে অন্যান্য গু(ত্বপূর্ণ বিজয়গুলির মধ্যে ছিল মালব ও (Garhkatanga) গড়-কাটাঙ্গাঁ।

বাস্তবিকই ১৫৫৬তে আকবর যখন মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এর বিশেষ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুকালে এই সাম্রাজ্যের সীমা কাবুল থেকে আহম্মদনগর ও পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন বড় মাপের সম্প্রসারণবাদী ছিলেন।

কিন্তু আকবরের রাজ্য জয়ের পিছনে প্রকৃত কারণগুলি কী ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ডঃ স্মিথ বক্ত(ব্য রেখেছেন, "স্বাভাবিক রাজকীয় উচ্চাকাঙ্খা ও পর্যাপ্ত (মতার মিশ্রণেরই ফল হল আকবরের রাজ্য জয়।" তিনি বলেছেন রাজার দায়িত্বই হল তাঁর এলাকা বিস্তৃত করা এবং অ্যানে বেভেরিজের মন্তব্যকে সর্মথন করেছেন। বেভেরিজের মতে, "আকবর ছিলেন এক শক্তি(শালী ও বলিষ্ঠ সম্প্রসারণবাদী, যাঁর সূর্যকিরণের লর্ড ডালহৌসীর তারকাদীপ্তি ম্লান হয়ে যায়।"

জি.ভি. ম্যালসন এবং ভ্যান নোয়ের-এর মত ঐতিহাসিকরা পূর্বোক্ত(মতের বিরোধিতা করে বক্ত(ব্য রেখেছেন যে আকবর কখনই কোনো আক্র(মণমূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। ম্যালসনের মতে তার সবক'টি যুদ্ধই ছিল প্রয়োজনের খাতিরে। ভ্যান নোয়ের মন্তব্য করেছেন, "শুধুমাত্র যুদ্ধ ও বিজয়ের দ্বারাই আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যস্থাপনের ল(্য পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল।"

লরেন্স বিনিয়ন এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্ত(ব্যের মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তৈমুরের একজন বংশধর হিসাবে ঐতিহ্যগতভাবে ও বংশসূত্রে আকবর ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি সামরিক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার খাতিরেও তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আসলে, মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতির ল(্য ছিল সারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। আবুল ফজলের মতে, স্থানীয় স্বার্থপর নৃপতিদের অনৈতিক স্বেচ্ছাচারের অধীনে অত্যাচারিত মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেবার ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আকবর যুদ্ধজয়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই কথা সর্বাংশে সত্যি নয় যে আকবর প্রয়োজনের খাতিরেই সাম্রাজ্যবাদী হয়েছিলেন এবং মানুষ হিসাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আইন, শৃঙ্খলা ও স্থিতাবস্থা ধরে রাখার জন্য যুদ্ধজয় খুবই গু(ত্বপূর্ণ। তিনি বলতেন, "একজন রাজার উচিত সর্বদাই যুদ্ধজয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নয়তো তাঁর প্রতিবেশীরাই তার বি(দ্ধে অস্ত্র তুলবে।" যখন তিনি উত্তর

ভারতের বৃহদাংশের অধী(র হয়েছিলেন, শুধুমাত্র তখনই তিনি ভারতবর্ষের মানুষকে নিরাপত্তাদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি শুধুমাত্র শক্তি(র ওপরেই নির্ভরশীল ছিল না। আকবর যুদ্ধ ও কূটনীতির এক মিশ্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র পশুবলের দ্বারা সমগ্র দেশের ওপর সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারবেন না। সুতরাং শুধুমাত্র কূটনীতি ব্যর্থ হলেই তিনি শক্তি(প্রয়োগ করতেন।

তাঁর গোড়ার দিকের যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিল্লী ও আগ্রা জয় জ(রী ছিল। কেননা, এই অঞ্চলগুলি ছিল যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রি(য়াকলাপের প্রাণকেন্দ্র এবং তাঁর পিতার অধিকৃত অঞ্চল ছিল।

মালব ও জৌনপুর ছিল এই রাজ্যের বর্হিসীমানা। তাই মালব ও জৌনপুর জয় দিল্লী ও আগ্রার নিরাপত্তার খাতিরে জ(রী ছিল। মালব ও জৌনপুরের মধ্যেকার অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল গোয়ালিওর, চুনার, মির্থা ইত্যাদি দুর্গের ওপর। সুতরাং ১৫৬১-৬২ সালের মধ্যে আকবর এই সমস্ত অঞ্চল দখল করেন।

আকবরের রাজপুতানা জয় নিশ্চিতভাবে তাঁর আত্র(মণমনাত্মক নীতিরই ফল ছিল। অবশ্য তিনি রাষ্ট্র রাজনীতিতে রাজপুতদের গু(ত্বও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। সম্প্রসারণের একসূক্ষ্ম নীতি আশ্রয় করে যে রাজপুতরা দুর্ধষ শত্রু হতে পারত তাদেরকেই তিনি মিত্র হিসাবে রাষ্ট্রের প(বিশাল সম্পদ করে তুললেন। তিনি রাজপুতদের তাঁর সামরিক রাষ্ট্রের স্তম্ভ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিবাহবন্ধন ছাড়াও তাঁর যুদ্ধবিজয় নীতি সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল। গন্ডোয়ানা রাজ্যে রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজত্ব করতেন। ১৫৬৪ সালে আকবর এই রাজ্য জয় করেন। এ(ত্রে তাঁর প(কোনো অজুহাত ছিল না যা তাঁকে এই কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

পরের দশ বছরের মধ্যে আকবর রাজস্থানের বেশীরভাগ অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং গুজরাট ও বাংলা জয় করেন। রাজপুত রাজ্যগুলি দখলের (ে ত্রে একটি মুখ্য পদ(েপ ছিল মেবারের রাজধানী চিতোর জয়, কেননা চিতোরকে মধ্য রাজস্থানের প্রবেশদ্বার হিসাবে গণ্য করা হত। চিতোর আকবরের মত "একজন ম্লেছ বিদেশীর" কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হওয়ায় আকবর উপলব্ধি করেন যে চিতোর জয় না করলে, অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি তাঁর আংশিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করবে না। তাছাড়া চিতোরের রাণা উদয় সিং আকবরের শত্রু ও মালবের প্রাত্ত(ন শাসক রাজ বাহাদুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মেবার রাজ্যটি গুজরাট যাবার পথে, অর্থাৎ দিল্লী ও আমেদাবাদের যোগাযোগের রাস্তার মধ্যে পড়ত। এই কারণে ১৫৬৭ সালে আকবর চিতোরের রাণা উদয় সিংকে অপসারণ করতে স(ম হন এবং ছয় মাস ধরে বীরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর চিতোরের পতন হয়। উদয় সিং এর পুত্র প্রতাপ সিংও এই সংঘাতের ফলে ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধেপরাজিত হন। এই দুই শক্তি(গোলন্ডার প্রান্তরে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দুই প(ই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবী করে। ১৫৯৭ সালে প্রতাপ তাঁর মৃত্যুর আগে চিতোর, আজমীর ও মন্দিরগড় বাদে মেবারের বাকী সমস্ত অঞ্চল পুন(দ্ধার করেন। সুতরাং আকবরের যুদ্ধজয় নীতি মেবারের (ে ত্রে সম্পূর্ণ সফল ছিল না।

১৫৭০ সাল নাগাদ চিতোরের পতনের পরে রাজস্থানের সবচেয়ে শক্তি(শালী দুর্গ রণথম্ভোর জয় করা হয়েছিল। যোধপুর আগেই জয় করা হয়ে গেছিল। এইসব বিজয়ের ফলে বেশীর ভাগ রাজপুত রাজ্য, যেমন কালিঞ্জর, বিকানীর ও জয়সলমীর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কয়েকটি রাজ্য, যেমন দুঙ্গারপুর, বন্সওয়ারা ও প্রতাপগড়ও বশ্যতা স্বীকার করে।

বাহাদুর শাহ মারা যাবার পর থেকে গুজরাট দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর উর্বর মাটি, এর উন্নত শিল্প এবং আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র হিসাবে এর গু(ত্ব, এইসবই গুজরাটকে লোভনীয় এক আত্র(মণের ল(্য করে তুলেছিল। হুমায়ুন গুজরাটে কিছুদিন রাজত্ব করায় আকবর গুজরাটের ওপর দাবী স্থাপন করেন। আরও একটি কারণ ছিল দিল্লীর কাছে

কিছু মির্জা বিদ্রোহে সফল না হতে পেরে গুজরাটে আশ্রয় নেন। এত সম্পদশালী একটি রাজ্যকে একটি প্রতিদ্বন্দী (মতার কেন্দ্র হতে দিতে আকবর রাজী ছিলেন না। ১৫৭২ সালে আকবর আজমীর ঘুরে আমেদাবাদে পৌঁছান। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই আমেদাবাদ আত্মসর্মপণ করে। এবার আকবর যে সমস্ত মীর্জারা সোপারা, ব্রোচ, বরোদা এবং সুরাট দখল করে রেখেছিলেন, তাদের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর কাম্বে বিজয় পর্তুগীজদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে। অবশেষে ১৫৭২-৭৩ সালে তৃতীয় মুজফ্ফর খানের নামেমাত্র আংশিক নিয়ন্ত্রণের বি(দ্ধে বিবদমান দলগুলির মধ্যে একদলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ লাভ করে তিনি লড়াইয়ে সুবিধা আদায় করতে স(ম হন এবং গোটা গুজরাট দখল করেন। তাঁর এই বিজয়কে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল, কেননা এর ফলে তারা গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি(পেয়েছিল।

বাংলায় আফগান শাসক সুলেমান কাররানির পুত্র দাউদ আকবরের আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না এবং পূর্বদিকে এক আফগান সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এইবারে আকবর যে সুযোগ খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী বাংলা আত্র(মণ করল এবং কঠিন যুদ্ধের পর দাউদ শান্তির জন্য আবেদন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শীগগিরই দাউদ আবার বিদ্রোহ শু(করেন। বাংলা ও বিহারে তখনও মুঘলদের অবস্থা খুব ভাল না হলেও আগের চেয়ে ভালভাবে মুঘল বাহিনীকে সাজান হয়েছিল এবং ১৫৭৬ সালে বিহারে এক কঠিন যুদ্ধের পর দাউদ খান পরাজিত হন এবং তাঁকে তখনই হত্যা করা হয়। এইভাবে পূর্ব ভারতের শেষ আফগান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

বিজ্ঞানসম্মত সীমানা স্থির করা ছাড়া আকবরের প(একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এই সীমানা স্থির করার জন্যই ১৫৮৫ সালে তিনি কা্মীর জয় করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

কাবুলে আকবর আত্র(মণাত্মক কোনো পদ(প নেননি। এ(ত্রে তাঁর ভাই মির্জা হাকিম বাংলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলে আকবরকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। ১৫৮১ সালে আকবরের কাবুলের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মর(ামূলক।

১৫৯৫ সালে বালুচিস্তান ও ১৫৯২ সালে সিন্ধ অধিকার আকবরের পূর্বপু(যদের অধিকৃত অঞ্চল পুন(দ্ধার করার জন্য জ(রী ছিল। আসলে কান্দাহারের বি(দ্ধে ওই অঞ্চলগুলিকে তিনি কাজকর্মের জন্য ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কান্দাহারের অসম্ভব সামরিক গু(ত্বের জন্যই আকবর একে জয় করতে চেয়েছিলেন। এতদিন হিন্দুকুশ পর্বত মধ্য এশিয়াকে আফগানিস্তান, বালুচিস্তান ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু হীরাটের উত্তর দিকে পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে একদল আত্র(মণকারীর ভারত আত্র(মণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যেহেতু কাবুল ছিল ভারতেরই অংশ, কান্দাহার ছিল আত্মর(ার প্রথম (ত্র। কান্দাহার এক গু(ত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রও ছিল। বেশ কিছু বাণিজ্যপথ এর মধ্যে দিয়ে গেছে। পর্তুগীজদের ভারত মহাসাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন ও পারস্যের সঙ্গে বিরোধের পর সমুদ্রপথ তেমন নিরাপদ না থাকায় এই বাণিজ্যপথ অধিকতর গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব কারণেই ১৫৯৫ সালে আকবর কান্দাহার জয় করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে এটি আবার পারস্যের অংশ হয়ে যায়।

ভারতীয় উপদ্বীপে আকবরের নীতি সম্পর্কে ভ্যান নোয়ের মন্তব্য করেছেন, "আকবর তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে দা(ণাত্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, অশান্তির একটি সমাধান হওয়া উচিত।" সুতরাং তিনি দা(ণাত্যের চারটি সুলতানশাহীকে মিলিয়ে একটিই সুলতানশাহীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভ্যান নোয়েরের এই মন্তব্যকে ভিনসেন্ট স্মিথ "ভাবপ্রবণ অর্থহীন উক্তি(" বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আসলে আকবর মনে করেছিলেন যে দা(ণাত্য দখল না হলে ভারতের ঐক্যবদ্ধতা সম্ভব নয়। উপরন্তু আকবর যখন উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পর্তুগীজরা নিজেদের দ(ণ পশ্চিম উপকূলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং একটি ভারতীয় শক্তি(হিসাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিল। সমগ্র মহাসাগরীয় বাণিজ্য ও মক্কার তীর্থযাত্রীদের সুর(ার প্র্নটি তাদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই বিদেশীদের তাড়াবার জন্য

দাি(ণাত্যে আকবরের শক্ত(মাটির প্রয়োজন ছিল। আকবরের দাি(ণাত্য অভিযান কখনই ধর্মীয় কারণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না। ১৫৯১ সালে আকবর আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও খান্দেশে রাষ্ট্রদূত পাঠান। কিন্তু একমাত্র শেষোক্ত(টিই তাঁর আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। অগত্যা আকবর যুদ্ধ করাই স্থির করেন এবং আহম্মদনগরের কিছু অংশ দখল করে নেন। তাঁর আসীরগড় দখল অবশ্য বি(্বাসঘাতকতার নির্দশন।

মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ছিল উচ্চাকাঙ্খা ও যুদ্ধকৌশলের মিশ্রণ। ভারতের তৎকালীন অবস্থাই মুঘল বিস্তারনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই বিস্তারনীতি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ সফল হলেও, দাি(ণাত্যে আংশিকভাবেই সফল হয়েছিল। শুধুই লুন্ঠন ও আগ্রাসন নীতির ভিত্তিতে এই সাম্রাজ্যবিস্তারকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সমস্ত বিজয়ের মাধ্যমে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বৃদ্ধি করে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা হয়েছিল।